কলিকাতা-নোয়াখালি-বিহার

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড
১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক: শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ
জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
আশ্বিন, ১৩৫৪
মূল্য দুই টাকা

জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেডের
মুদ্রণ বিভাগে [অবিনাশ প্রেস—১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট,
কলিকাতা] শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ কর্তৃক মুদ্রিত

বিদেশীর ভাঙন-মন্ত্রের ফলে
নিরপরাধ যাহারা প্রাণ দিল,
আর, প্রাণ থাকিতেও যাহারা
নিষ্প্রাণের অধম হইয়া রহিল,
তাহাদের উদ্দেশে

বিশ্বাস

[১]

নিজের দেশের মন্ত্রীকেও কি অবিশ্বাস করিতে হইবে ?

কেন হইবে না ?—মন্ত্রণা কথাটার মধ্যেই তো মিথ্যার আভাস রহিয়াছে—গুপ্তি, কূটনীতি এসবই তো মিথ্যা, মন্ত্রীর এক নাসারন্ধ্রে তো মিথ্যার হাওয়াই প্রবহমান, তা'না হইলে রাজ্য চলে কি করিয়া ?

পরেশ সেটা অস্বীকাব করে না, কিন্তু এর পরেও তার তর্ক আছে—বলে—কিন্তু সে তো বহিঃ-শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষে। নিজের প্রজা বলিয়া যাহাদের মানিয়া লইলাম তাহার সম্বন্ধেও বঞ্চনার মন্ত্রণা কেন ? সেখানে তো নিছক্ বিশ্বাসেরই সম্বন্ধ।

—আসল কথা, এই যুগে চলা-ফেরা করিলেও পরেশের মাথাটা আছে সেই যুগে যাহাতে বিশ্বাস জিনিসটা ছিল সত্য। হাত পা মাথা একসঙ্গে করিয়া জাবন ধারণ না করিবার যে ট্র্যাজেডি পরেশের জীবনে সেই ট্র্যাজেডিই ঘটিল। রহমানের ট্র্যাজেডি সম্বন্ধেও কতকটা সেই কথাই খাটে।

ওরা দুজনে প্রতিবেশী, এই কলিকাতারই একটি পল্লাতে। এর আগে শুধু প্রতিবেশী বলিয়া পরিচয় দিতে গেলে গভীর

অন্যায় করা হইত ওদের প্রতি; ওদের মধ্যে ছিল বন্ধুত্ব—খাঁটি সোনার মতোই খাঁটি; এখন পরেশও আছে, হয়তো রহমানও আছে, নাই শুধু মাঝখানের সেই খাঁটি সোনাটুকু।

কে অপহরণ করিল সেটুকু?

একটা ছোট পার্কের ধারে বাড়ি এদের দুজনের। জায়গাটুকুর বিশেষত্ব এই যে, এখানকার বসতিটা হিন্দু আর মুসলমানের মিশ্র বসতি। দাঙ্গায় দাঙ্গায় এই দুইটা সম্প্রদায় এত আলাদা হইয়া গেছে যে এদের একসঙ্গে দেখিলে একটু কেমন যেন নূতন লাগে, তাই কথাটা বলা, নয়তো ওদের উভয়ের দেশ, ওরা একসঙ্গে থাকিবে এ আর এমন বলিবার কথা কি? ছোট পল্লী, প্রায় শ'দেড়েক ঘর; আজকাল শতকরা ভাঙিয়া সংখ্যা দেওয়াই নিয়ম—সে-হিসাবে অর্ধেকের কিছু বেশি মুসলমান। যে-অংশটায় রহমানের বাড়ি সেখানে বোধ হয় আরও একটু বেশি; মাঝে একটা পুকুর-বোজানো মাঠ। বোধ হয় লড়াইয়ের জন্যই জমি বিলি হয় নাই, বাড়ি ঘর ওঠে নাই, জায়গাটা খালি পড়িয়া আছে; তাহার পরে আবার বাড়ি ঘর।

রহমানদের অংশের পল্লীর এটা পিছনে পড়ে, সামনে পার্ক।

পার্কের অপরদিকে ছিল পরেশদের ভাড়াটে বাসা। পার্কটা চারিদিককার বাড়িগুলার প্রাঙ্গণ। শীতের প্রায় সমস্ত দিনটাই আর গ্রীষ্মের অপরাহ্ণে পল্লীর চারিদিকের ছেলেমেয়েরা, বৃদ্ধেরা

নামিয়া এই জায়গাটুকুকে ভরাট করিয়া রাখে। এইখানেই একদিন প্রাক্-স্কুল দিনে ওধারের শিশু-পরেশের সঙ্গে এধারের শিশু-রহমানের ভাব হইয়া গেল।...তাহার পর স্কুল; যোগা-যোগ এমন—একই স্কুলে, একই ক্লাসে ওদের হইল যাত্রা আরম্ভ। এটা যে-সময়ের কথা সে-সময় স্কুলের ঘরে পাকিস্তান-হিন্দুস্থানের খড়ি কাটিয়া দিবার লোক হিন্দুস্থানে জন্মায় নাই।

স্কুলের পর কলেজের দুটো ক্লাস, তাহার পর একটু আগু-পিছু করিয়া চাকরির জীবন। উভয়েই মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সন্তান, পড়ার বিলাসটা আর বেশিদিন চলিল না। চাকরিটা আর এক-জায়গায় জুটিল না, ওরা দিনের মধ্যে ছয়-সাত ঘণ্টা করিয়া আলাদা হইয়া পড়িল।

এটুকু বিচ্ছেদ বোধ হয় জীবনের পক্ষে ভালো,—সকাল সন্ধ্যা আর রাত্রে ওরা দুজনে আরও ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। এই সময় বিবাহও হইল দুজনের। বিবাহের নূতন দিনগুলিতে মানুষ শুধু নব-বধূকেই চায় না, পুরানো বন্ধুকেও তাহার বড় বেশি-প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

আরও একটা দিক আছে। একদিন শিশু-পরেশ হঠাৎ গিয়া শিশু-রহমানের বাড়ির ছেলে হইয়া গেল। সেই দিনই বা পরের দিন শিশু-রহমানও আসিয়া শিশু-পরেশের বাড়ির সবার হৃদয় জয় করিয়া গেল। শিশুর মতো এমন দিক্‌বিজয়ী বীর তো আর হয় না। এর পরে শিশুর সূত্র ধরিয়া দুই পরিবারে হইল আলাপ, হৃদ্যতা, মাখামাখি। মধ্যাহ্নের নির্জনতায় পরেশের

মা পিসিরা পার্ক অতিক্রম করিয়া রহমানের বাড়ি আসিতে লাগিলেন; রহমানের আজি, মা বোরখা পরিয়া ঐ পথে পরেশের বাসায় উপস্থিত হইতে লাগিলেন। পরেশের পিসির সঙ্গে রহমানের মায়ের সম্বন্ধ দাঁড়াইল ভাজের, বোরখা লইয়া ঠাট্টার স্রোত বহিল। পরেশের পিসি হাসিয়া বলিলেন, "তোমার বোরখা না ঘোচাই শেষ পর্যন্ত তো আমায় তখন বোলো"... রহমানের মা হাসিয়া উত্তর দিলেন—"তোমার মাথার কাপড় খুলে ধিঙ্গিপনা করে বেড়ান বের না করি তো আমার নাম আমিনা নয়।"...শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার সময় একখানি কাপড়ের মধ্যে সেলাই করিয়া কি একপ্রস্ত উপহার দিলেন, দিব্যি দেওয়া রহিল শ্বশুরবাড়িতে গিয়া একেবারে সবার সামনে খুলিবে, তার আগে নয়।...মোড়কটা খুলিতে বাহির হইল একখানি শাড়ি, একটি ব্লাউস, কিছু প্রসাধন দ্রব্য আর একখানি বোরখা—তাহাতে একটি ছোট কাগজ পিন্ করা আছে, লেখা আছে—"ধিঙ্গিপনার ওষুধ।"

অনেকদিন আগেকার কথা এসব। এর মধ্যে অনেকগুলা দাঙ্গাও হইয়া গেল,—সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। প্রাচ্যের সাম্রাজ্ঞী কলিকাতার রাস্তাঘাটের আবর্জনার জন্য নাম আছে, কিন্তু শুধু আবর্জনায় কুলায় না তার, রক্তের দরকার হয়; শয়তানের পূজার জন্য এই যে আবর্জনার পুষ্প এগুলাকে রক্তচন্দনে মাখাইয়া লইতে হয়।...ওদিক্‌কার দাঙ্গাগুলা কিন্তু ছিল অন্য ধরণের, তাহাতে দেশের শত্রু ইংরাজের হাতটা ছিল স্পষ্ট, তাই ইতরেরা যোগ দিত, ভদ্রেরা দূরে থাকিত। এর ব্যতিক্রম ছিল,

তবে এই ছিল সাধারণ নিয়ম। এ পাড়ায় কখনও কিছুই হয় নাই; সম্প্রদায় নির্বিশেষে বয়স্কেরা, বৃদ্ধেরা পার্কের মধ্যে অভিবাদন বিনিময় করিয়া ব্যথার সঙ্গে আলোচনা করিত, পরেশ-রহমানের বাড়ির মেয়েরা যেন ভাবিয়া কূল পাইত না—সম্ভব হয় কি করিয়া এমন সর্বনেশে কাণ্ড।

ও-যুগটা গেল। রহমানের আজি গেলেন, তাহার পর একে একে পরেশের বাবা গেলেন, রহমানের অম্মাজন গেলেন, পরেশের মা গেলেন, রহমানেরও বাপজান গেলেন! দুই পরিবারের ঊর্ধতন পুরুষ নিঃশেষ হইয়া একেবারে নবীনের পালা আসিল। নূতন যুগও আসিল—যুদ্ধবিগ্রহ, হানাহানি, কাটাকাটি এ তো তাহার সাধারণ দান—সর্বজনের জন্য; ভারতের জন্য বিশেষ করিয়া আনিল এক নূতন সওগাৎ, যুগযুগের ইতিহাসে কেহ যে জিনিস কখনও কল্পনাতেও আনিতে পারে নাই। এই নূতন সওগাৎ একখানি খড়গ—দেশমাতার অঙ্গচ্ছেদ করিবার জন্য দেশের ছেলেই সেটা তুলিয়া লইল; মনুষ্যত্বের একটা আবরু রক্ষা করিবার জন্য ঘোষণা করিল, সে এ মায়ের সন্তানই নয়।

দেশের শত্রুর অভিসন্ধি হইল পূর্ণ, সে হাতের আড়ালে ক্রূর হাসি চাপিয়া আসরের পিছনে গিয়া একটি নিরাপদ কোণ বাছিয়া লইল।

এই সময় এদের উভয়েরই পরিবারে স্ত্রী, নিজে, দু' একটি বাহিরের প্রতিপাল্য; ছেলেয়-মেয়েয় চারিপাঁচটি করিয়া সন্তান —সাধারণতঃ হিন্দু বা মুসলমানের পরিবার যেমন হয়।

আর একটা খবর, পরেশের ভারাটিয়া বদনাম অনেক দিন ঘুচিয়াছে। রহমানের বাড়ির খান দশেক বাড়ি পরে তাহার বিধবা ফুফুর খানিকটা জমি ছিল; রহমানের পিতা সুবিধায় পরেশকে সেইটুকু কিনাইয়া দেন, তাহার পর বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতেই নিজের তত্ত্বাবধানে তাহার একটি বাড়ি করাইয়া দিয়া যান; পরেশরা এখন সেই বাড়িতে।

[২]

ভাঙনের কল-কাঠি বহিঃশত্রু যতদিন নিজেদের হাতে রাখিয়াছিল ততদিন ব্যাপারটা ছিল এক রকম, দেশের লোকের হাতে তুলিয়া দিয়া যখন সে চতুর দ্রষ্টার ভূমিকা গ্রহণ করিল তখন থেকে ব্যাপার দাঁড়াইল অন্য রকম। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ভেদনীতি হইল আরও সফল। আগে ছিল "মন্দির ভাঙো, মসজিদ ভাঙো"-রব, তাহার চেয়ে 'দেশ ভাঙো' রবটা আরও মিষ্ট লাগিল—এক তরফা রব, কিন্তু সংঘর্ষে আটকাইল না, অখণ্ড ভারতীয়েরাও তো রহিয়াছে ওদিকে, হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েই। এত বিরাট একটা গণ্ডগোল যে তাহার মধ্যে বাংলার পঞ্চাশ লক্ষ দুর্ভিক্ষ-মুমূর্ষুর হাহাকারও চাপা পড়িয়া গেল—তাহারা হিন্দুও ছিল, মুসলমানও ছিল।

শ্রাদ্ধটা আরও গড়াইয়া চলিল। তাহার কারণও টের পাওয়া গেল পরে। লোকে ভাবিয়াছিল নটের গুরু বা শ্রাদ্ধের

পুরোহিত চার্চহিলের রাজনৈতিক মৃত্যু হইয়াছে ; হয়তো হইয়াছে (কেননা ইংরাজ রাজনৈতিকদের মধ্যে জ্যান্ত মড়া প্রভেদ করা শক্ত) কিন্তু কথায় বলে স্বভাব যায় না মলেও— রাজনৈতিক মৃত্যু হইলেও চার্চহিলের নৈতিক মৃত্যু ঘটে নাই, সে আগের মতোই ভাঙনের মন্ত্র ছাড়িয়া চলিতেছে।

এ সব কিন্তু এ কাহিনীর মুখ্য অংশ নয়, পটভূমিকা মাত্র। এর পুরোভাগে যেটা আদৎ ব্যাপার সেটা এই যে, যে-মনকষা-কষিটা এক সময় অশিক্ষিত ইতর-সাধারণের মধ্যে আসিয়া পড়িত, তাও সাময়িক বিক্ষোভে, সেটা এখন ভদ্র সাধারণের মধ্যে কায়েমি হইয়া বসিয়াছে।

এই পরিস্থিতির মধ্যে বম্বেতে একদিন দেশচ্ছেদ-বিশ্বাসীদের দল হঠাৎ জেহাদ ঘোষণা করিয়া বসিল—বাহ্যত ইংরাজ রাজশক্তি আর হিন্দু উভয়ের বিরুদ্ধে ; কিন্তু কার্যত যে সেটা মাত্র হিন্দুদের বিরুদ্ধে হইবে সেটা সকলেই বুঝিতে পারিল, কেননা ইংরাজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে ওরা তখনও অস্ত্র ধরে নাই, বচনে অনেক জেহাদ ঘোষণা করিয়াছে বহুবারই।...উনিশ-শ বিয়াল্লিশের কীর্তি ছিল কংগ্রেসেরই।

গরম গরম জিনিস বেশি মুখরোচক—জেহাদের উল্লেখে বাতাস একটু ভারাক্রান্ত হইল। বাংলার হিন্দুর প্রতি কর্তারা গোড়া থেকেই একটু বেশি বিরূপ, আস্কারার সাহস আছে, বাংলার মন্ত্রীর গলা অন্য সবাইয়ের চেয়ে একটু বেশি শোনা যাইতে লাগিল।

এই বড় ব্যাপারের সঙ্গে একদিন একটি ছোট ব্যাপার ঘটিয়া বসিল। সেদিন কথা ছিল রহমান পরেশকে ডাকিয়া লইয়া সিনেমায় যাইবে। দেরি হইয়া গেল দেখিয়া পরেশ নিজেই জামা জুতা পরিয়া বাহির হইয়া পড়িল। দূর থেকেই রহমানের বাড়ির বাহিরের বারান্দাটা দেখা যায়। রহমান রাস্তার দিকে পিছন করিয়া একটি চেয়ারে বসিয়া আছে; মাঝখানে একটি টেবিল, তার ওদিকে একটা বেঞ্চ, খানকতক চেয়ার, তাহাতে জন চারেক যুবক বসিয়া। পরেশ আর একটু অগ্রসর হইতেই রহমান একবার ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল—মনে হইল যেন সামনের যুবকদের মধ্যে কেহ উহাকে পরেশের কথাটা বলিয়াছে। পরেশকে দেখিয়া রহমান নিশ্চয় উহাদের কিছু বলিল, উহারা সকলেই একটু যেন ত্রস্ত ভাবেই একসঙ্গে উঠিয়া পড়িল, এবং সেলাম করিয়া বারান্দা হইতে নামিয়া সামনের রাস্তা দিয়া ডান দিকে চলিয়া গেল। দু'একজন পিছন ফিরিয়া একবার পরেশকে দেখিয়াও লইল। একটু কি রকম বোধ হইল পরেশের; কিন্তু সিনেমার সময় হইয়া আসিয়াছে, অতটা গ্রাহ্য করিল না। রাস্তা ছাড়াইয়া সামনে একটু জমি পড়ে, সেটা পার হইতে হইতে তাহার মনটা বেশ ছাঁৎ করিয়া উঠিল—সামনের টেবিলটা হইতে রহমান কতকগুলা ছড়ানো কাগজপত্র তাড়াতাড়ি গুটাইয়া লইতেছে; পরেশ যতক্ষণে বারান্দায় উঠিবে ততক্ষণে সবগুলা গুটাইয়া তাড়াতাড়ি একটা রোলারের মতো করিয়া করতলগত করিল।

বলিল—"তুই-ই এসে গেলি ?…যাবি নাকি ?"

পরেশের হাতে ঘড়ি ছিল, দেখিয়া বলিল—"এখনও আছে সময়…এক হিসেবে ; মানে, খানিকটা তো টপিক্যাল দেখাবে…"

"তাহলে চল্…দেরি করিয়ে দিলে…"

"কারা ছিল ওরা ?"

—কথাটা পরেশ সাদা কৌতূহল বশেই বলিল, আর নিতান্ত রহমান বলিয়াই, না-লুকোচুরির কেমন একটা সংস্কার আছে দু'জনের মধ্যে তো ?

"আর বলিস নি…বলব এক সময়…যত সব ঝঞ্ঝাট !…" বলিতে বলিতে রহমান ভিতরে চলিয়া গেল।

অবশ্য বলিবার সময় আর পাইল না। দিন কতক কাটিয়া গেল।

[৩]

হাওয়াটা আরও গরম হইয়া উঠিল। গলাবাজি বাড়িল—মন্ত্রিমণ্ডলের কণ্ঠ যে তাহার মধ্যে শুধু বিশিষ্ট তাহাই নয়, জেহাদের দিনটা তাহারা একটা ছুটির দিন বলিয়া ঘোষণা করিল। বাংলার মন্ত্রিমণ্ডল সব তাতেই অগ্রণী, ওদের পুরোগামী-দের জমার খাতায় আছে পঞ্চাশ লক্ষ স্বজাতীয়ের প্রাণসংহার, তাদের মধ্যে স্বধর্মীরই বেশি ; এরা অন্ততঃ এমন একটা দিনে

ছুটিটুকু না দিলে উত্তরাধিকারের মর্যাদা বজায় থাকে কি করিয়া ? ···বাহিরের শত্রু ব্রিটিশ অন্য সময় আপত্তির একটা গলাখাঁকারিও দেয়, এক্ষেত্রে শুধু নীরবে হাসিতে লাগিল।···বাঙালী-হিন্দু, আজ তোমার জন্যই 'কুইট ইণ্ডিয়া' দিয়া আমার অভিনন্দন ; যাচ্ছি, কিন্তু তোমায় শেষ না করে নড়ব ভেবেছ ? বুদ্ধিজীবী বলেই তোমার গুমর, তা দাবার চালেই তোমায় দুরস্ত করব !

ছুটিতে হিন্দুরা আপত্তি করিল, এক-সাম্প্রদায়িক মন্ত্রিমণ্ডল, আপত্তি টিকিল না। একটা আসন্ন বিপদের আশঙ্কার পাশে পাশে উঠিল উল্লাসধ্বনি।

সেই দিন আফিস হইতে ফিরিতে পরেশ ওদের একটা বড় মিছিলের সামনে পড়িয়া গেল। ট্রামে আসিতেছিল, তাড়াতাড়ি কাটাইয়া আসিল মিছিলটা, কিন্তু একটা দৃশ্যে তাহার বুকটা সেদিনের চেয়েও বেশি ছাঁৎ করিয়া উঠিল—মনে হইল যেন মিছিলের একেবারেই সামনে কয়েক জনের সঙ্গে রহমান। ট্রামটা জোরে বাহির হইয়া যাওয়ায় এবং পিছনে ভিড়টা চাপ বাঁধিয়াছিল বলিয়া, বেশ ভালো করিয়া দেখা গেল না ; মনটা কিন্তু অনেকক্ষণ ধরিয়া খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল। যতই সময় যাইতে লাগিল ততই জোর করিয়া পরেশ মনকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল—ও রহমান নয়—হইতে পারে না···বাঃ, এতবড় কলিকাতা সহরটা, প্রায় চল্লিশ লক্ষ লোকের বাস, রহমানের মতো একটা লোক থাকিবে না ? এ যে অন্যায় কথা !

ট্রাম থেকে যখন নামিল, খুঁৎখুঁতুনি অনেকটা গেছে, তবুও কিন্তু একটু অন্যমনস্ক ভাবেই বাড়ি প্রবেশ করিল। একবার ইচ্ছা হইল খোঁজ লয় রহমান ফিরিয়াছে কি না; কিন্তু তাহার মধ্যে যে একটু অবিশ্বাসের ছিটা রহিল তাহাতে নিজের কাছেই লজ্জা বোধ হইতে লাগিল।

রহমান স্বয়ংই আসিল, রাত প্রায় সাড়ে দশটার সময়, পরেশ যখন আহার করিয়া বাহিরে বসিয়া আছে। চেহারাটা একটু নূতন ধরণের, একটা যেন ঝড় বহিয়া গিয়াছে তাহার উপর দিয়া।···মিছিলের কথাটা পরেশ অনেকটা ভুলিয়া গিয়াছিল, মনে পড়িয়া গেল। প্রশ্ন করিল "হঠাৎ এত রাতে?—এই ফিরলি নাকি?"

বোধ হয় শেষের প্রশ্নটার জন্যই রহমান একটু থতমত খাইয়া গেল, বলিল—"না, এখন ফিরব কেন? ফিরেছি তো অনেকক্ষণ। এত রাতে—মানে, একটা কথা তোকে বলতে এলাম—ইয়ে··· তুই এই বাড়িটা ছেড়ে একটু অন্য জায়গায় চলে যা।"

বলার মধ্যেই স্বরটা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

পরেশ একটু বিস্মিত ভাবে চাহিয়া রহিল, তাহার পর প্রশ্ন করিল—"হঠাৎ?"

রহমান একটু চুপ করিয়া রহিল—যেন কি বা কতদূর বলা চলে মনস্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছে না, তাহার পর বলিল— "ভালো বুঝছি না তেমন।"

"কি নিয়ে?"

"এই যা হচ্ছে সব···চোখ কান বুজে থাকলে চল্‌বে না তো···লোক ক্ষেপে যেতে কতক্ষণ ?"

"মন্ত্রীদের স্পীচের কথা বলছিস ? একটা বলা দরকার, বলেছে, ওদের উদ্দেশ্য তা হতে পারে না—They can never mean it. ওদের দায়িত্ব বোঝে ওরা, পার্টি পলিটিক্স, হাওয়াটা গরম রাখা দরকার, রাখছে।"

রহমান একটু মাথাটা নিচু করিল, তারপর হঠাৎ তুলিয়া বলিল—Don't live in a fool's paradise পরেশ—ওরা serious."

পরেশ একটু হাসিয়া বলিল—"আমি নিশ্চিন্ত মনে আকাশ-কুসুম দেখছি না রহমান. দেখছে তারা যারা পাকিস্তানের কল্পনায় বিভোর রয়েছে, আর, সবচেয়ে বড় কথা তারা নিজেও জানে যে ওটা আকাশকুসুম। ইংরেজের নাচানোতে..."

রহমান হঠাৎ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—"আকাশকুসুম !"

পরেশ স্তম্ভিত হইয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিল, প্রশ্ন করিল—"তুইও করিস নাকি বিশ্বাস ?"

"অবিশ্বাসের কি···"

—সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল—"ওসব বাজে কথা রাখ ; কালই বাড়ি খুঁজে উঠে যা—আমিও দেখব চেষ্টা না হয়।"

পরেশ একটু হাসিয়া বলিল—"পাকিস্তান থেকে তাড়াবি ?"

তারপর তাহার হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, বলিল—"বেশ, তোর

কথাই সই, কিন্তু জিন্না সাহেবের এদিককার স্টেটমেণ্টটা দেখেছিস তো ?—স্পষ্টই তো বলেছে, হিন্দুদের বিরুদ্ধে কোন অভিসন্ধি নেই, এখানকার মন্ত্রীদেরও তো ঐ সুর, সে রকম উগ্র নেইতো আর, কাগজগুলো পড়ছিস না ?···দিন যতই এগিয়ে আসছে, নিজেদের দায়িত্বজ্ঞান নিশ্চয় ফিরে আসছে ; বুঝছে তো—যা বলে ফেলেছে তাতেই খানিকটা মিস্‌চিফ্ হয়ে পড়বে।"

রহমান যেন একটা অবলম্বন পাইল, বলিল—"বেশ, সেই মিস্‌চিফ্-এর জন্যেও না হয় অন্য জায়গায় কয়েক দিন চলে যা ···নিজের ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে দে..."

পরেশ হাসিয়াই বলিল—"সে আর এমন কি ?—খানকতক দোকানপাট লুট হবে, একটু ছোরাছুরি ; কলকাতার লোকের আর তার জন্যে অন্য জায়গায় গেলে চলে না।···তা ভিন্ন মনে হয় মিনিস্ট্রি সেটাও ঘটতে দেবে না, প্রিকশান্ নেবে।···আর, মাথার ওপর একটা গবর্ণরও তো রয়েছে ; সেও তো নাকে তেল দিয়ে ঘুমুতে পারে না।···সবাই কি স্টুয়ার্ট সায়েব হতে পারে ?"

রহমান আবার একটু চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর প্রশ্ন করিল—"তাহলে তোর বিশ্বাস নিয়ে নিশ্চিন্দি হয়ে বসে থাকবি ?"

"অত অবিশ্বাস নিয়েই বা কতদিন বাঁচব ?"

তাহার পর হাসিয়া বলিল—"তা নয়, সে রকম কোন সম্ভাবনা নেই বলেই বলছি। ওদের এদিককার স্টেটমেণ্টগুলোর মানে আছে। অবশ্য অনেক কিছু ঘটছে, তবে এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা করবে তার এমন কি কারণ আছে ? There

seems to be a positive ring of sincerety in what they are saying now."

রহমান একটু অন্যমনস্কভাবে চাহিয়া রহিল। পরেশই বলিল—"মনে হচ্ছে এখনও খাসনি, যা। না হয় বসছি, খেয়ে আয়, পাকিস্তান-হিন্দুস্থানের ঝগড়া মেটানো যাবে।"

"আজ আর আসতে পারব না, ক্লান্ত আছি একটু।" বলিয়া রহমান উঠিয়া পড়িল।

খানিকটা গেছে, পরেশ আবার ডাকিল; বলিল—"ওরে রহমান, নুরীর মা পুডিং ক'রে পাঠিয়ে দিয়েছিল, খেলাম; বলে দিস চমৎকার হয়েছিল।"

নুরুন্নেসা রহমানের ছোট মেয়ে, সব ছোট সন্তান। রহমান হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল; কি ভাবিল, তাহার পর আসিয়া পরেশের হাতটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"বাড়িটা ছেড়ে সরে যা দুদিন বলছি।...না, জিদ করিস নি।"

রহমান আবার যখন নিজের বাড়ির কাছে গেছে তখন পরেশের মিছিলের কথাটা মনে পড়িল; কিন্তু আর ডাকিল না।

[৪]

এটা তের তারিখের কথা। গোলমালটা খুব বাড়িয়া চলিল। এলোমেলো গোলমাল, একটা খবরের সঙ্গে অন্য খবরের সংঘর্ষ,—মন্ত্রীরা সমস্ত রাজবন্দীদের খালাস করিয়া

দিতেছে ; তাহার পাশেই গুজব—না, ওটা মুলতুবি রহিল, আপাতত যত অন্তরীণ মুসলমান গুণ্ডা আছে তাহাদের ছাড়িয়া দেওয়া হইবে, পবিত্র জেহাদে যোগদান দিবার জন্য। সহরের খানিকটা অংশ একটু ছমছমে হইয়া উঠিল, খানিকটা অংশ পরেশের মতো বিশ্বাসে রহিল নিশ্চিন্ত, নিষ্ক্রিয়। পরেশ-রহমানদের পাড়ায় নিশ্চিন্ত থাকার একটা সংস্কারই জন্মাইয়া গেছে, তবুও পাকিস্তানী পতাকার একটু বেশিরকম প্রাচুর্ভাব দেখা গেল। ছু'তিনটা হিন্দু পরিবার পাড়া ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কিন্তু তাহারাও গেল নিস্তুতি রাতে ; প্রতিবেশীদের অবিশ্বাস করিয়া সরিয়া যাইতেছে এটা খোলাখুলি জানাইয়া যাইতে তাহারাও যেন লজ্জিত। পাড়ার একটা সম্ভ্রম ছিল, তাহাতে এই ভাবে একটু ঘুণ ধরিল।

মন্ত্রীরা ওদিকে আশ্বাস দিতে লাগিল—মাভৈঃ, আমরা রহিয়াছি কি করিতে ?…রহমানের আর দেখা পাওয়া গেল না। পরেশ তাহার পরদিন বিকালে অভ্যাসমতোই ওর বাসায় গিয়া শুনিল সে বাহির হইয়া গেছে। বাড়ির ভিতর ছেলে-মেয়েদের মধ্যে খুব হট্টগোল চলিতেছে, মনে হয় যেন মিছিলেরই ছোট সংস্করণ। গলার আওয়াজ শুনিয়া নুরা ছুটিয়া আসিল, কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলিল—"খালাজান তুমি খেলবে না ? বলে পাকিস্তান জিন্দাবাদ!"

পরেশ তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিল, হাসিয়া বলিল—"কিন্তু তোর বাবা তো আমায় তাড়িয়ে দেবে পাকিস্তান থেকে—তখন ?"

নুরীর মা আসিয়া দুয়ারের পিছনে দাঁড়াইল, প্রয়োজন হইলে এইরূপ পর্দার আড়াল হইতে সাধারণতঃ একটু চাপা গলায় কথা কয়; আজও আড়ালটা রাখিল, কিন্তু বেশ জোর গলাতেই বলিল্—"নুরী, জিগ্যেস কর বন্ধুর পাগলামি ঘোচাতে পারছেন না? আজ আপিস যান নি, সমস্ত দিন কি করে বেড়াচ্ছেন—আজ ক'দিন ধরে—কারা সব যাওয়া-আসা করে—আমার কাছে চাপাচাপি···আমার যে অসহ্য হয়ে উঠেছে···"

কণ্ঠে আশঙ্কা, অভিমান, উদ্বেগ—সব আছে, শেষে যেন একটু ধরিয়াও আসিল।

কয়েক সেকেণ্ড পরেশের মুখে কোন উত্তর জোগাইল না—মিছিলের কথা মনে পড়িয়া গেল, আর সে দিন কয়েকজন যুবককে লইয়া সেই জমায়েৎ, সেই কাগজপত্র গুটাইয়া ফেলা···মনটাকে গুছাইয়া লইয়া বলিল—"আমি পাগলামি ঘোচাব কি, ও আমায় শুদ্ধু পাগলামিতে টেনেছিল আর একটু হলে—বলে বাড়ি ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যা।···যাক্ ভয় নেই, আপনিই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, তবে রোদে বৃষ্টিতে ঘোরাঘুরি করে অসুখে না পড়ে যায়।"

তাহার পর একটু হাসিয়া বলিল—"বৌঠানের বাঁধন কিন্তু অত আলগা হলে চলবে না।"

মন্ত্রীরা আশ্বাস দিয়া যাইতেছে। এদিকের গুজবের জটলাও যাইতেছে বাড়িয়া। সহরের আবহাওয়ায় যেন একটা কি রহিয়াছে—যেখানে সেখানে ফিসফিসানি—প্রেতলোক থেকে

যেন একটা চাপা শব্দ ভাসিয়া আসে মাঝে মাঝে—দৃষ্টিতে কোথাও হিংস্র জ্বালা, কোথাও কুটিল সংশয়—কিছু না থাক্, একটা সহজ প্রসন্নতার অভাব তো আছেই। এ আবহাওয়ায় মন্ত্রীদের আশ্বাসবাণী এক এক সময় কানে লাগে বেখাপ্পা—কিন্তু অসম্ভবটাকে কল্পনা করা যায় না—হাজার হোক্ এই দেশেরই তো সন্তান এরা—রাজা মন্ত্রী যখন দায়িত্ব লয়, তখন ঈশ্বর থাকেন সাক্ষী—খোদা বলুক, আল্লা বলুক, একই তো।...এই সব তর্কও আছে, তা ভিন্ন মানুষের মনের গঠনই এমন যে, যারা শীর্ষে তাদের সহসা অবিশ্বাস করিতে চায় না। এদের মধ্যেই অনেকে যে পঞ্চাশ লক্ষ স্বজাতির মৃত্যুকলুষিত—এত বড় তত্বটাও সবাই ভুলিয়া বসিয়া আছে।

মানুষের অবিশ্বাসের সীমা আছে, কিন্তু বিশ্বাসের সীমা নাই।

[৫]

ষোল তারিখ আসিয়া পড়িল, "জেহাদের" দিন।... "জেহাদ!"—এরা একবার ভাবিল না কতবড় একটা কথাকে কত উঁচু থেকে কত নিচুতে টানিয়া নামাইল। ওদের ধর্মগ্রন্থের একটা পবিত্র শব্দ—শুধু স্বার্থকলুষিত রাজনীতিতে একটু সুযোগ সুবিধার জন্য ধূলায় দিল মিশাইয়া।...জেহাদ না বলিলে লোকে খেপিবে কেন?—ভাই ভাইয়ের গলায় ছুরি দিবে কি করিয়া?

মন্ত্রীপরিষদের ফতোয়ার দিনটা রহিল ছুটির দিন।...

উপভোগের অবকাশ চাই না? আমি রচনা করিলাম একটা অতি-নাটক—বিরাট এক ট্র্যাজেডি; আমিই যদি না পাইলাম দেখিতে, আমায়ই যদি দপ্তরে বসিয়া দস্তখতে মাতিয়া রহিতে হইল তো তাহার চেয়ে আর বড় ট্র্যাজেডি কি হইতে পারে?

সকাল থেকে দিনটা থমথমে হইয়া রহিল। আরও শান্ত. অবিশ্বাস-আতঙ্কে আরও যেন চাপা। দিন যত বাড়িতে লাগিল সেই শান্তি ভাঙিয়া ততই ঘন ঘন শব্দ উঠিতে লাগিল—'পাকিস্তান জিন্দাবাদ!…লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান!'…এখানে-ওখানে—চারিদিকে।…ময়দানের দিকে সব মিছিল চলিয়াছে।

খুব কাছে একটা শব্দ শুনিয়া পরেশ জানলার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। পার্কের ওধার হইতে একটা দল পার্কের ভিতর দিয়া চলিয়া আসিতেছে, দৃষ্টি ঘুরাইয়া দেখিল, রহমানের বাড়ির সামনেও একটা বড় জমায়েৎ, ওপারের দলটা আসিয়া তাহার সঙ্গে মিলিল—একটা তুমুল নিনাদে সমস্ত বাড়িটা কাঁপিয়া উঠিল।

এক সময় এদিককার সমস্ত শব্দ থামিয়া গেল। অর্থাৎ দল সব চলিয়া গিয়াছে। ওদের সম্মেলনটা ময়দানে, যেখানে ঈদের দিনে সবাই প্রার্থনায় জমে।…সেখানে থাকিবে বাংলার মন্ত্রীরা, সেইখানে মন্ত্র উচ্চারিত হইয়া জেহাদ শুরু হইবে।…স্থান মাহাত্ম্য চাই না একটু? ধর্মযুদ্ধ যে!

বেলা প্রায় তিনটে, যুদ্ধ-হুঙ্কারের লেশমাত্র নাই কোথাও, পাঞ্জাবী গায়ে দিয়া চটিজোড়াটা পরিয়া পরেশ বাহির হইয়া পড়িল। মেজ মেয়েটি অসুস্থ, একটা ঔষধ আনিতে হইবে।

গলি হইতে বাহির হইয়াই বড় রাস্তার উপর মিত্র অ্যাণ্ড কোম্পানির ঔষধালয়। দোকানটা বন্ধ। এর পরের দোকানটা রাস্তার একেবারে ওপ্রান্তে, অনেকটা দূর। আজ সমস্ত দিন বাহির হয় নাই, রাস্তার চেহারাটা কেমন যেন বোধ হইল,—লোক খুব কম, দোকান পাট প্রায় বন্ধ।…আগেরও দোকানটা বন্ধ থাকিতে পারে, তবুও একবার দেখিয়া আসাই স্থির করিল, বড় দরকারি ঔষধটা।

প্রায় কাছাকাছি গেছে এমন সময় দেখা গেল, চার পাঁচজন ছোকরা মোড় ঘুরিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়িয়া আসিতেছে।—"পালাও! বন্ধ করে দাও দোকান—আসছে!…" বলিতে বলিতে ছুটিয়া সামনের দিকে চলিয়া গেল। …তাহাদের পিছনে আরও কিছু লোক; তাহার পরেই একটা গর্জন—বহুদূরে যেন মত্ত সমুদ্রের কল্লোল—প্রতিমুহূর্তেই আওয়াজটা আরও স্পষ্ট—আরও বিকট—'পাকিস্তান!…মারে—জ্বালাও!…'

পরেশের মুখটা শুকাইয়া গেল। বিশ্বাসে প্রথম আঘাত লাগিল।

কল্লোলটা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে—দূরে—কাছে, অলি-গলি—চারিদিকে—জলটা যেন নদী খাল খানা খন্দর—সর্বত্র ঢুকিয়া পড়িয়াছে। প্রথমেই মনে পড়িল রুগ্ন কন্যা অরুণার মুখটা, পরেশ ঘুরিয়া ছুটিল। খানিকটা আসিয়া একবার শব্দে আকৃষ্ট হইয়া ঘুরিয়া দেখিল, একটা বিরাট জনতা বড় রাস্তায় ঢুকিয়া পড়িয়াছে—সঙ্গে দুধারে লুটতরাজ, খুন,

অগ্নিকাণ্ড—অনেকটা দূর তবুও দেখা যাইতেছে—একটা ছোরা সূর্যোদয়ের আলোয় ঝলকিয়া উঠিয়া বিদ্যুত বেগে নামিয়া পড়িল —আরও একটা—আরও—আরও…ঘুরিয়া আবার ছুটিল, কিন্তু কয়েক পা অসিয়াই হঠাৎ পা তাহার ভারিয়া গেল—তাহাদের পল্লীর দিক হইতেও এই সাগর-কল্লোল। এক দিক হইতে নয়, চারিদিক হইতে ফেলিয়াছে ঘিরিয়া…ওকি!…ধোঁয়া ওঠে যে! …কার বাড়ি থেকে!…আরও ধোঁয়ার স্তম্ভ! আরও একটা!… পরেশের হাঁটু মুড়িয়া যাইতেছে—স্বপ্নে দৌড়ানোর মতো। পিছনের দল আগাইয়া আসিতেছে ; কতকটা প্রাণভয়ে, কতকটা পৃথিবীতে যারা সবচেয়ে প্রিয়তম, যাদের জন্য সব—তাদের টানে ছুটিল পরেশ।…গলির মুখে আসিয়া পড়িল।

মাথাটা তখন যেন অনেকটা বিকৃত হইয়া গেছে—যাহা দেখিতেছে যেন ভাল বুঝিতে পারিতেছে না—একটা মস্তবড় মানুষের চাপ—কত সবুজ পতাকা—চাঁদ আর তারা—সামনে আগাইয়া যাইতেছে—কাজ তাহাদের যেন এখানে শেষ হইয়াছে—সামনে কিন্তু আরও অনেক কাজ…

অতি-বিশ্বাসের নিশ্চয়তায় আঘাতটা আরও বেশি করিয়া লাগিয়াছে। শুধু শাসকেরা নয়, বন্ধুও যে ছিল বিশ্বাসের গণ্ডীর মধ্যে। পরেশ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল,—তাহার এর মধ্যে কি করিবার আছে ? মনে পড়িতেছে না পরেশের…

সামনের কল্লোলটা আগাইয়া গেল। পিছনে রহিল আর্ত্তনাদ, জ্বলন্ত আগুনের শিখা…ওটা না মিত্তিরদের বাড়ি ?

পিছনের কল্লোলে পরেশের সম্বিৎ হইল; আবার ছুটিল, অর্থ বুঝিতেছে—খালি ধ্বংস—ধ্বংস—পাকিস্তান—মন্ত্রীদের জেহাদ—ঠিক, রহমানও তো ছিল!

বড় রাস্তার দলটা চীৎকার করিতে করিতে চলিয়া গেল; অগ্নিশিখার সঙ্কেৎ—এদিকে কাজ হয়ে গেছে—শক্তি-ক্ষয়ের প্রয়োজন নাই, তোরা আগাইয়া যা…

পরেশ বাড়ির সামনে আসিল, জানালা দুয়ার সব ভাঙ্গা। একটা জানালার খানিকটা আগুনে খাবলাইয়া লইয়াছে; আগুন কিন্তু নির্বাপিত, জল দিয়াই।

বাড়িতে কিন্তু সাড়া শব্দ নাই কেন?

পরেশ আর একটা ঝোঁকে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়া থামিয়া পড়িল, উঠানের মাঝখানে—প্রায় একজায়গায় জড়ো করা পরেশের সংসার বলিতে যারা সবাই—স্ত্রী সুরমার পানে চাওয়া যায় না। শুধু নিহত করিয়াই পরিতৃপ্ত হয় নাই ওরা…

একেবারে এতগুলো মৃত্যুর সামনে মানুষ কাঁদিতে পারে না।—নয়ন তো সমুদ্র নয়? পরেশ বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতে সামনের থামে কয়লার আঁচড়ে একটা লেখার উপর নজর পড়িল, খুব তাড়াতাড়ি লেখা—"কি আর করা যায়? আমার মানা ছিল, কিন্তু জেহাদের উত্তেজনায় এরা বাড়ি ঠিক করতে পারে নি। রহমান।"

'কি আর করা যায়'—ত্রিশ বৎসরের সুহৃদ রহমানের নিজের হাতে লেখা!

সমস্ত বিশ্বসংসার মুছিয়া গিয়া পরেশের সামনে মাত্র দুইটি মূর্তি জাগিয়া রহিল—দেশের মন্ত্রী আর ত্রিশ বৎসরের সুহৃদ রহমান। একবার বিশ্বাসের মূল্যসমষ্ঠির পানে চাহিয়া লইয়া পরেশ ধীরে ধীরে নামিয়া গেল।

[৬]

বিশ্বাসের মূল্য দিতে হইল রহমানকেও।

সমস্তদিন চলিল ধ্বংসলীলা, শুধু হিন্দু—শুধু হিন্দু, রাত্রের আকাশও মথিত করিয়া শব্দ উঠিতে লাগিল। রায়টে কলিকাতা এ পর্য্যন্ত কাহারও কাছে মাথা নত করে নাই, আজ নিজের কাছে নিজে হার মানিল।

সতের তারিখের দুপুর হইতে খবরটা যেন বাঁকা বাঁকা শোনা যাইতে লাগিল। রহমান ভীষণ ক্লান্ত ছিল, বাহির হয় নাই, ছেলে সমীম্ আসিয়া বলিল—"বাবা শুনেছ বালিগঞ্জ, ভবানীপুর, শ্যামবাজারের দিকের খবর ?"

রহমানের কথাগুলো একদিনেই চোয়াড়ের মতো হইয়া গেছে। মুখটা খিঁচাইয়া বলিল—"শুনেছি ; এত কাঁচা ব্যবস্থা নয়, সমস্ত রাজ্যটা চালাচ্ছে ওরা, কাউকে মাথা তুলতে হবে না। তুই আর বেরুস নি, শরীরটা ভালো নয় তোর···বুঝলি ?"

"বুঝলি ?" কথাটা হঠাৎ এমন একটা বিকট চীৎকারের সঙ্গে বিকৃত কণ্ঠে বলিল যে, সমীম একটু অপ্রতিভ ভাবে চাহিয়া

রহিল। কাল থেকেই এই রকম হইয়াছে, এক একটা কথায় যেন হঠাৎ মনের গ্লানি উছলিয়া পাড়িতেছে। স্ত্রী রাবেয়া আসিয়া দাঁড়াইল; কাছেই আড়ালে ছিল। ও কাছে কাছেই থাকিতেছে, তবে স্বামীর দৃষ্টি বাঁচাইয়া। কোলে নুরী, বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরা।...কাল দোতলা বাড়ির উপর থেকে একটি নুরীর মতোই মেয়েকে ছুঁড়িয়া ফেলিল—ফ্রক্‌টা হাওয়ায় ফন্ ফন করিয়া উড়িতেছে—একটা চীৎকার, পৃথিবীতে কেউ কখনও সে রকম চীৎকার শোনে নাই—তারপর সব শেষ। হোক তারা মুসলমান, কিন্তু রাবেয়ার সেই থেকে কেমন একটা আতঙ্ক ধরিয়া গেছে, নুরীকে বুক ছাড়া করিতেছে না।...এ দুর্বলতার দৃশ্য রহমানের সহে না—কাল থেকে সহিতেছে না, অনেকবারই শাসাইয়া দিয়াছে স্ত্রীকে।

উগ্রভাবে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—"কি ?"

"তুমিও বাইরে যেও না আর।"

"তাহলে ?...তুমি যাবে ?...ঐ অতবড় একটা দলকে চালাতে হবে...যা চাইবে তাই করতে দিতে হবে—ঠাণ্ডা হয়ে এলে তাতিয়ে দিতে হবে—পারবে ?...পারা উচিত কিন্তু।"

রাবেয়া ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল; হাত দুইটা শুধু আপনা আপনিই নুরীর উপর যেন চাপিয়া বসিল।

খুব ক্ষীণ, কিন্তু দীর্ঘায়িত একটা শব্দ ভাসিয়া আসিল—"জয় হিন্দ্‌! বন্দেমাতরম্‌!"...বহুদূরে কোথায় যেন, কাল থেকে সেই একটানা পাকিস্তান ধ্বনির এই প্রথম ব্যতিক্রম।

তিন জনের কানেই গেল; একবার পরস্পরের মুখের পানে চাহিল।

রহমানের ঠোঁটটা কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, দাঁতে দাঁতে চাপিয়া বলিল—"জয় হিন্দ্!···আমাকে দিয়েও একদিন বলিয়েছিল!··· ভাঁওতা!"

তাহার পর সমস্তটা যেন ঘাড় হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া সহজ কণ্ঠে স্ত্রীকে বলিল—"এটা বাংলা—বাংলা!—বাংলা!!··· শুনছ?···একটাও কাফেরের হাত এর শাসনকে নোংরা করছে না।"

তারপর আবার বিকৃত স্বরে হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"আমার মেয়ে হয়তো নুরীকে বারান্দার ধারে খেলনা দিয়ে বসিয়ে রাখোগে।···জয় হিন্দ্!—ভয় দেখাচ্ছে! ওঃ!"

নিচে থেকে ডাক আসিল—"রহমান ভাই আছেন?"

সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছেলে জালাল উঠিয়া আসিল, বলিল—"দলের ওরা ডাকছে।"

রহমান নামিয়া গেল। কয়েকজন যুবক, দু'একজন পাড়ারও আছে, এদেরই কয়েকজনকে পরেশ সেদিন দেখিয়াছিল। উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি; একজন বলিল—"শুনছেন খবর ওদিককার?"

তাহার পর কয়েকজন একসঙ্গে জড়াজড়ি করিয়া বলিল—"শুনছি ভয়ানক অর্‌গেনাইজ্‌ড্ হয়ে গেছে···শিখেরাও আছে··· হিন্দুস্থানীরাও···শেঠেরা কি বলছে শুনেছেন?···"

রহমান একটু বিরক্ত ভাবে হাত উঁচাইয়া বলিল—"এক এক ক'রে।···কিছু নতুন কথা নয়। যারা তোমাদের নামিয়েছে এই পবিত্র জেহাদে তারা জানে; যাও, তোমাদের নিজের কাজের কতদূর দেখোগে, আর ঘণ্টা খানেকের মধ্যে বেরুতে হবে।"

শব্দ হইল—'জয় হিন্দ্!!···বন্দেমাতরম্!!"

আরও আগাইয়া, আরও জোরে এবং মনে হইল কণ্ঠের সংখ্যাও দ্বিগুণ হইয়া গেছে। রহমান একটু বিরক্তভাবে অন্যমনস্ক হইয়া গেল—রাবেয়ার পায়ের শব্দ, নুরীকে লইয়া দরজার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বিকৃত স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—"কায়ের সব!"

রাবেয়াকে লক্ষ্য করিয়াই কথাটা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, যদিও যুবকদের দিকে চাহিয়া। যতটা পারিল নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া বলিল—"যাও সব। তোমরা কাদের প্রটেক্‌শনে রয়েছ মনে রেখো···"

কি একটু ভাবিল, তারপর বোধ হয় হুকুমের সঙ্গে যুক্তি মিশাইয়া সবার বিশ্বাস সৃষ্টির জন্যই বলিল—"এই তো আমি রয়েছি, স্ত্রী, পাঁচটা ছেলে মেয়ে, বাড়ি, বিষয়সম্পত্তি—অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়েছি নাকি? তোমরা জোয়ান, নির্ঝঞ্ঝাট···"

একটি ছেলে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল—"আমাদের ওদিকটা শেষ করে দিয়েছে···বাপজান, ভাইজান কাউকেও···"

বছর তেরচৌদ্দ বয়স ; একেবারে ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

আওয়াজ উঠিতেছে—"জয় হিন্দ্!! বন্দেমাতরম্!!"

আরও উন্মত্ত—আরও কাছে—আরও মানুষ—একটা ধুঁয়ার শিখা দেখা দিল।

রহমান যেন প্রাণপণে সংযত থাকিবার চেষ্টা করিতেছে, তা সত্ত্বেও বিকৃত কণ্ঠেই বলিয়া উঠিল—"ওরা কি করছে?...গাছে তুলে দিয়ে..."

হঠাৎ খেয়াল হইল। বারান্দা থেকে নামিয়া রাস্তা ধরিয়া ছুটিল। টেলিফোনে যাইতেছে। চারিদিকে চাঞ্চল্য পড়িয়া গেছে। দূরের গর্জন আরও কাছে আসিয়া পড়িল।

নিকুঞ্জ বসুর বাড়ি টেলিফোন ; দোর জানালা ভাঙা, পোড়ানো...রহমান দুই তিনটা সিঁড়ি একসঙ্গে পার হইয়া উপরে উঠিয়া গেল।...টেলিফোনটা ছেঁড়া, ভাঙা, ছত্রাকার। দেয়ালে হঠাৎ চোখ গেল, জানালা-পোড়ানো কয়লায় লেখা —"পাকিস্তান!"

বিরাট নিনাদ—বাঙালী, পশ্চিমা, শিখ। পার্কের রাস্তায় ঢুকিয়া পড়িল নাকি?

নামিয়া রহমান আবার সামনে ছুটিল—প্রশ্নের গাঁদি ঠেলিয়া ; ও এ পাড়ার সর্দার হইয়াছে এই অভিযানে। একটা বাড়িতে উঠিয়া পড়িল। মাঝের ঘরের মধ্যে দিয়া উপরের রাস্তা। প্রবেশ করিতেই একজন বৃদ্ধ চীৎকার করিয়া শোফা হইতে উঠিয়া পড়িলেন—"বেরোও! বেরোও! আভি নেকালো!!"

সৌম্যমূর্তি বৃদ্ধ মুসলমান, সম্ভ্রান্ত ; বাড়িতে মেয়েদের কেহ নাই ; চারটি ছেলে গুণ্ডামিতে নামিয়াছে—এরই প্ররোচনায়, চারটিরই দুইদিন হইতে দেখা নাই। কানের দোষে আওয়াজ-গুলো শুনিতে পান নাই ; রহমানকে দেখিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। রহমান আরও ক্ষিপ্ত, কিছু গ্রাহ্য না করিয়া কয়েক লাফে উপরে উঠিয়া গেল।

টেলিফোন।—

"নং..."

উৎকট প্রতীক্ষার মুহূর্ত। অন্য কণ্ঠে উত্তর হইল।

—"কে ?"

একটা সঙ্কেত দিয়া রহমান বলিল—"আমাদের পাড়ায় পুলিস বা মিলিটারি দরকার—এখুনি।"

"চেষ্টা-হচ্ছে ; সামলে থাকুন ততক্ষণ।"

অদ্ভুত উত্তর। রহমান কিছু বলিবার আগেই ওদিকে ছাড়িয়া দিল। রহমান ডাকিল—"নং..."

"কোন উত্তর নাই।"

"জয়হিন্দ্—বন্দেমাতরম্" গলির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে ; আর সন্দেহ নাই। যন্ত্রটায় একটা ঝাঁকানি দিয়া রহমান আবার ডাকিল—

"নং..."

নিরুত্তর।

রহমান একটা প্রবল ঝটকা দিতে টেবিল সুদ্ধ টেলিফোনটা

ছিঁড়িয়া ছিটকাইয়া ছত্রাকার হইয়া পড়িল। তাহারই একটা অংশ চক্ষু দিয়া অনুসরণ করিতে গিয়া জানালার মধ্য দিয়া ওদিকে দৃষ্টি পড়িল।…ধুঁয়া !

ছুটিয়া গিয়া জানালার গরাদে ধরিয়া দাঁড়াইল। ধ্বংসলীলা—বাঙালা, বিহারী শিখ,…মুসলমান—মাখামাখি…

মুহূর্তখানেকেই চৈতন্য হইল—ছুটিয়া আবার সেই ঘরে নামিল। ঘর অন্ধকার, দোর জানালা সব বন্ধ। ঝোঁকের মাথায়ই ছুটিয়া দোর খুলিতে গিয়া সের খানেকের এক তালায় হাত পড়িল ; অন্ধকারের আলোটুকুও যেন নিভিয়া গেল। রহমান চীৎকার করিয়া উঠিল—"হাজী সায়েব !!"

বধির বৃদ্ধ গোলমালের আঁচ পাইয়া হলঘরের দুয়ারে দুয়ারে তালা দিয়া ঘরটা নিরাপদ করিয়া ভিতরে কোথায় গিয়া বসিয়া আছেন। রহমান চীৎকার করিতে করিতে ভিতরের দিকের দরজায় গিয়া আছড়াইয়া পড়িল। তালা দেওয়া। নূতন বাড়ি, মজবুৎ কবাট জানালা…কোনও উপায় নাই…

আবার উপরে ছুটিয়া গেল। উপরে বাহিরের দুয়ারটিতে তালা আঁটিয়া বৃদ্ধ ওদিকে চলিয়া যাইতেছেন—দীর্ঘ বারান্দার শেষ দিকে। কালা, তায় দূরে, তায় পিছন ফিরিয়া ; রহমানের মনে হইল এইবার যেন গলা চিরিয়া রক্ত বাহির হইয়া আসিবে।

নিচে ঘর, উপরে ঘর, মাঝখানে সিঁড়ি।—এইটুকুর মধ্যে অসহায়ভাবে আবদ্ধ রহমান কয়েকবার ছুটাছুটি করিয়া আবার

উপরের জানালার সামনে দাঁড়াইল।…কাল, আজ সকালে পর্যন্ত ওরাও এই ধ্বংসলীলায় মাতিয়াছিল না কি? কী চমৎকার! কোথায় পাকিস্তান?—ঐ দোজকের মধ্যে দিয়া তো দেখা যায় না…

আর একটা ধোঁয়ার স্তম্ভ।…ওদের বাড়ি—রহমানের নিজের বাড়ি! রাবেয়া আছে—বুকে জাপটানো নুরী…সমীম্, জালাল, মেহের, কাদের…

"দাগাবাজ!!"

—বলিয়া চীৎকার করিয়া ঘুরিতেই চোখে পড়িল রাঙা সিল্ক দিয়া মোড়া একটি গ্রন্থের মতো—একটা টেবিলে রাখা। সামনে একটা চেয়ার।…মনে পড়িল—হাজী সাহেবের কোরাণ।

"ইয়া আল্লা, বাঁচাও ওদের!"—বলিয়া অসহায়ভাবে রহমান মোড়াটাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল,—রাবেয়া যেমন নুরীকে জড়াইয়া ধরে। সেইভাবেই সামনে গিয়া দাঁড়াইল।

কে জানে কে বাঁচিল না বাঁচিল। ধ্বংসলীলা চলিয়াছে। কাল, আজ সকালে ওরাও কি এই ব্যাপারই করিয়াছিল?…কেন?

এ বাড়ির দুয়ারেও কি ধাক্কা পড়িতেছে?…

কেহ বাঁচিবে না। না হিন্দু, না মুসলমান, একখণ্ড দেশ থাকিবে পড়িয়া—শ্মশান-শকুনেরা উল্লাসে ডানা ঝাপটাইতেছে।

"ইয়া আল্লা!" বলিয়া রহমান আবার মোড়াটাকে বুকে চাপিয়া ধরিল।

* * *

হঠাৎ নজরটা দূরে গিয়া পড়িল। পার্কের এক কোণে কে ও ?—স্থির, কঠিন অথচ যেন অর্থহীন দৃষ্টিতে সামনে চাহিয়া আছে…

রহমান চিনিল—ত্রিশ বৎসরের চেনা, ক্রোশেক দূরেও চেনা যায়, এতো মাত্র কয়েক গজ দূরে ঐ পার্ক।

পরেশ।…আর বুকে কি ওর ?…রাবেয়ার মতো করিয়া দুই ভীত, ব্যাকুল বাহু দিয়া জড়ানো ?…নুরী না ?…হ্যাঁ নুরীই তো—তাকে জীবনের পারাপার থেকেও যে যায় চেনা…

প্রায়শ্চিত্ত

তিনজনেই নোয়াখালি ফেরৎ, কটু অভিজ্ঞতায় তিনজনের মন পূর্ণ, শুধু তফাৎ এই যে একই ভাবে প্রভাবিত নয়।

সুখময় বলিল—"আগে কথাটা মানতাম না, এখন দেখছি সত্যিই একথা বলা যায় না যে অমুক ব্যাপারের একেবারে চূড়ান্তটা দেখা হয়ে গেল।—একসময় মনে হয়েছিল পাশবিকতার শেষমন্ত্রটি বুঝি হিরোশিমায় উচ্চারিত হয়ে গেল, তারপর দেখা গেল পনেরই আগষ্টের কলকাতা আছে আবার তারপরেও অক্টোবরের নোয়াখালি বাকি ছিল; অতঃ কিম্?"

সোমেন বলিল—"নভেম্বারের বিহার।"

সুখময় টিপ্পনীটুকুতে একটু আড়চোখে চাহিয়া হাসিল, বলিল—"তুমি ভুল বলছ সোমেন, জাপান পরে যদি এটম্ বম্ ফেলে নিউইয়র্ক ধ্বংস করত, এ তো বলা যেত না যে সয়তানির ফার্ষ্ট প্রাইজটা তারই প্রাপ্য; বিহার প্রতিশোধের জন্যে কলকাতা-নোয়াখালির নকল করতে গেছল, সয়তানির রাজটিকা তার প্রাপ্য হয় কি করে? দুটো সম্প্রদায়—বেশ, না হয় স্বীকার করলাম এক জাত নয়—ওরা যখন বলছে আমরা আরব দেশের বেদুইন তো স্বীকার করে নেওয়াই ভালো—বেশ তোমরা তাই; কিন্তু প্রতিবেশী তো? প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন

বিরোধও তো নেই, শুধু পাঁচের পাশে পঁচানব্বই বলে সেই পাঁচকে উচ্ছেদ করে দিতে হবে ?

মৃত্যুঞ্জয় বলিল—"কি করবে—সেই পাঁচ যদি ওদের গায়ে বেঁধে।"

"এতদিন বেঁধে নি তো।"

"যখন পাশে রয়েছে, যে কোন দিন বিঁধতে পারে, সেই সম্ভাবনাটা বন্ধ করে দিচ্ছে, দোষটা কোথায় ?"

"তাহলে আমাদেরও পঁচাত্তরের গায়ে পঁচিশটা বিঁধবে বলে সেই ব্যবস্থা করতে পারি। সমস্ত দেশটা ধরে বলছি।"

মৃত্যুঞ্জয় মুখটা অন্য দিকে ফিরাইয়া লইয়া বলিল—"পারতে বাধা কি ?—তবে তোমরা জান, ভগবান তোমাদের গণ্ডারের চামড়া দিয়েছেন, হাজার খোঁচা খেলেও বিঁধবে না ; নিশ্চিন্দি আছ, থাকবেও।"

তিনজনেই খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহারপর সুখময়ই বলিল—"তুমি ওদের সব কাজই সমর্থন করবার জন্যে মুখিয়ে রয়েছ মৃত্যুঞ্জয়, কিন্তু সত্যিই কি তুমি অস্বীকার করতে পার যে চার্চহিলের প্ররোচনায় কয়েকজন স্বার্থান্বেষীর হাতে পড়ে মুসলমান জাতটা নিজেদের আত্মাকে হারিয়ে ফেলছে—অর্থাৎ মানুষ হিসেবে সে তার আত্মিক বৈশিষ্ট নষ্ট করে ফেলছে ?"

মৃত্যুঞ্জয় সেই রকম কঠিন মুখেই বলিল—"তোমরা যে অর্থে 'আত্মা আত্মা' করে লাফালাফি কর কথায় কথায় সে অর্থে হয়তো

করছে নষ্ট, কিন্তু দেহটা বজায় রাখছে ; তোমাদের যে দেহ আত্মা দুই-ই গেল, তার কি ব্যবস্থা করছ আগে তাই বলো।”

আর একটু নীরবতা, তারপর সুখময় বলিল—“সোমেন কিছু বলছ না যে? তুমিও তো কম দিন কাটালে না নোয়াখালিতে।”

সোমেন তর্কের মধ্যে বাহিরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বসিয়াছিল, উত্তর করিল—“আমায় বেশি রকম আশাবাদী বলে বদনাম দিয়ে রেখেছ, যেখানে এত মৃত্যুর ছড়াছড়ি সেখানে আমার কোন কথা কি আমল পাবে?”

সুখময় বলিল—“আমল তো দেখছ আমরা কেউ কারুর কথাকে দিচ্ছি না, যদি নাই দিই তোমার কথাকেও ক্ষতি কি? —এমন কথাতো বলতে পারি না যে, বিধাতা পুরুষ আমাদের ভোট না নিয়ে এক পা এগুবেন না।...বলো তোমার বক্তব্যটা ; যেমন বাড়াবাড়ি করে তুলেছেন তিনি, দুটো ফাঁকা আশার কথা শুনলেও তাঁর চক্রান্তটা একটু এড়িয়ে থাকা যাবে।”

সোমেন একটু হাসিল, ‘চক্রান্ত’ কথাটার জন্য কি ‘আশার কথা’র সঙ্গে ‘ফাঁকা’ এই বিশেষণটা জুড়িয়া দেওয়ার জন্য কিছু বোঝা গেল না, তাহারপর বলিল—“আমি অভিমত না দিয়ে আমার একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি, তা থেকে যা বোঝ তোমরা।”

অল্প একটু ভাবিয়া লইয়া বলিতে আরম্ভ করিল—“আমাদের ক্যাম্প খোলার চারদিন পরের কথা। সেদিন খুব বেশি রকম অবসন্ন হয়ে সন্ধ্যের একটু আগেই ফিরেছি। খুব যে ঘুরেছি

তা নয়, তবে যা দেখছি চারদিন ধরে, যে-সব কাহিনী শুনছি তা এতই মর্মন্তুদ, সভ্য মানুষের সমাজে এতই অসম্ভব গোছের যে মনটা যেন অসাড় হয়ে এসেছে। দামোদর বন্যায়-এর আগে আমি কাজ করেছিলাম, তারপর সেবারে মেদিনীপুরেও, মানুষের দুর্গতির চরম দেখেছি, কিন্তু একদিনের জন্যে উৎসাহ হারাইনি, মনে পড়ে কোন দিন রাত দশটার আগে বাড়ি ফিরি নি, টানা মাসখানেকের ওপরের ইতিহাস বলছি ; নোয়াখালিতে চারদিনের মধ্যেই বুঝলাম বেশ ভেঙে পড়ছি। কারণটা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ। শত্রুর সঙ্গে লড়া যায়, তাতে অবসাদের বদলে উৎসাহই আসে, তা সে-শত্রু মানুষই হোক বা দৈবই হোক ; বর্ধমান-মেদিনীপুরে দৈব এসেছিল শত্রুর বেশে, মানুষের পক্ষ থেকে তার চ্যালেঞ্জটা হাতে করে তুলে নিয়েছিলাম, বুকে বল পেয়েছিলাম, নোয়াখালিতে শত্রুর সাক্ষাৎ পেলাম না ...”

সুখময় বাধা দিয়া প্রশ্ন করিল—“চোখে ঠুলি বেঁধে কাজ করছিলে ?”

সোমেন বলিল—“মুসলমানদের কথা বলছ, কিন্তু তারা কি সত্যিই শত্রু ? ভূতে পাওয়ার গল্প নিশ্চয় শুনে থাকবে ; সে-অবস্থায় বাড়ির নিতান্ত আত্মীয়ের আচরণও এমন হয়ে পড়ে যা বাইরের লোকের কাছেও আশা করা যায় না। মুসলমানকে ইংরেজ-ভূতে পেয়েছে, যাকিছু হচ্ছে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে ইংরেজ করাচ্ছে ওদের দিয়ে। এই জন্যে নোয়াখালির কাণ্ড দেখলে আক্রোশের চেয়ে অবসাদই আসে বেশি, নিজের লোক

পরের হাতের অস্ত্র হয়ে করছে বলে ট্রাজেডিটা দ্বিগুণ হয়ে দেখা দেয়, যে আসল শত্রু তার সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে না বলে বড় যেন নিরুপায় বলে মনে হয়। এর সঙ্গে আর একটা কারণ ছিল, নোয়াখালির পশুলীলা সব জায়গায় একরকম ভাবে হয় নি, কোনখানে প্রধানত ধর্মের ওপর দিয়ে গেছে, কোনখানে ঘরবাড়ির ওপর দিয়ে, কোনখানে হত্যার ওপর দিয়ে; আমাদের যে অঞ্চলটায় ক্যাম্প খোলা হয়েছিল সেখানে পশুত্বের আর কোনও দিকটা বাকি ছিল না—আগে ভয় দেখিয়ে চাঁদা আদায় করে নিয়ে গেছে—লীগের চাঁদা—এই ধারণা দিয়ে যে তাদের কিছু বলা হবে না, তারপর উৎকটতর পশুত্বের প্রেরণায় লুটতরাজ করে গেছে, ঘর জ্বালিয়ে গেছে, তারপরেও এসে করেছে ধর্মান্তর, হত্যা, মেয়েদের অপমান। একটা বাড়িতে দুটি মাত্র মানুষ দেখলাম—একজন বৃদ্ধ আর তার বছর ছয়-সাতেকের একটি নাতি। এর ওপর দিয়ে সব ঢেউগুলি এক এক করে ভেঙে গেছে। বেশ সম্পন্ন গেরস্ত, খানচারেক পাকা ঘর, গোটাকতক চালা, দুটো টিনের, সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভেঙেচুরে তছনছ করে দিয়েছে। মেয়ে পুরুষে একুশ জন লোক ছিল—ঐ দুটিতে দাঁড়িয়েছে।

মেয়েদের মধ্যে তাদেরই শেষ করে নি যাদের নিজেদের অন্তঃপুরে ভরে রাখা যায়। সব চেয়ে চরম হচ্ছে ঐ বৃদ্ধ আর তার নাতি ঐ শিশুটিকে ছেড়ে দেওয়া। জানো পশুত্বের মধ্যেও আর্ট আছে, এ তাই। বৃদ্ধ গেছে পাগল হয়ে। বদ্ধ

পাগল নয়, আর সবই প্রায় স্বাভাবিক, শুধু মাঝে মাঝে ঐ নাতিটিকে নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ায় আর হাত-পা নেড়ে, মুখ লাল করে ষ্টেজ-অ্যাক্‌টিং করে—সে ওর নাতিকে দিয়ে এর প্রতিশোধ একদিন নেওয়াবে। ঐ সময়টা তার কিছু ঠিক থাকে না—আস্ফালনের সঙ্গে অ্যাক্‌শন্ পৈতে ছেঁড়া আর তাতে গেরো দেওয়া—গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে ময়লা পৈতেটা রুদ্রাক্ষের মালার মতন হয়ে উঠেছে। ছেলেটাও কচি হাত তুলে হুঙ্কার করে—কেউ কিছু বলে না, অনেক জায়গায় বরং ডেকে শোনে। জীয়ে রেখেছে, উপভোগ করবার জন্যে ; যেন প্লের পর একটু ফার্সের দরকার হয় তো ?"

সুখময় বলিল—"তবু তুমি শত্রু দেখতে পাও নি !"

সুখময় একটু হাসিয়া বলিল—"না, তবুও আসল শত্রুকে ছেড়ে দৃষ্টিটা আমার নকল শত্রুর ওপর এসে পড়েনি।...যাক্, আসল বক্তব্য থেকে অনেকটা দূরে এসে পড়েছি, যা বলতে যাচ্ছিলাম শোন। ক্যাম্পে এসে একটু অবসন্ন হয়ে শুয়ে পড়েছি। এমন সময় অতুল বলে ক্যাম্পেরই একটি ছোকরা এসে খবর দিলে একটি ছেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে ; বললাম নিয়ে এসো। একটু পরেই ছেলেটি এসে সামনে দাঁড়াল। বয়স সতের-আঠার বছর হবে, বেশ সবল চেহারা রংটা ফরসা, গায়ে একটা ফতুয়া, তার নিচে এক গোছা মোটা ধপধপে পৈতে ঝুলছে। চুলটা সমানভাবে ছোট ছোট করে ছাঁটা, মাছখানে একটি টিকি আছে। মুখটায় পাড়াগেঁয়ে ছেলের

সরলতা মাখানো, তার সঙ্গে কিন্তু এমন কিছু একটা আছে যাতে মনে হয় বাড়িতে ওর কৃষ্টি আছে, পাঁচটা ভালোমন্দ কথা আলোচনা হয়, চোখে মুখে চিন্তার ছাপ আছে।

এসে নমস্কার করে দাঁড়াল, কি দরকার জিগ্যেস করতে বললে ক্যাম্পে থেকে কিছু রিলিফের কাজ করতে চায়। তারপর আরও প্রশ্ন ক'রে জানা গেল বাড়ি ওর ঢাকা জেলার পশ্চিম প্রান্তে, জাতিতে বৈদ্য, নাম বললে কিরণচন্দ্র সেনশর্মা। রিলিফ ক্যাম্পে কাজ করা অভ্যেস আছে কিনা জিগ্যেস করায় বললে—না, এই প্রথম ওর এ কাজে নামা, কি কি কাজ করতে হয় খোঁজ নিয়েছে, পালা করে যে রাঁধতেও হয় ঐটুকু সে পারবে না, আগুনের তাত একেবারে সহ্য হয় না, বারণও কবিরাজের। বললাম—"বেশ, করো কাজ।"

তার পরদিন থেকেই ছেলেটি কাজে একেবারে মেতে উঠল। তার কাজ দেখে মনে হোল তার সামনে এতদিন একটা বাধা ছিল, হঠাৎ সেটা সরে যেতে তার উৎসাহটা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, কি বাধাটা আমি তখন টের পাইনি, তবে ওদিকে কাজে মেতে ওঠার সঙ্গে সে যেমন আমার দিকে কৃতজ্ঞতায় আকৃষ্ট হয়ে উঠল, তাতে মনে হোল বাধাটা যাই হোক আমা হতেই সেটা অপসারিত হয়েছে। আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করতাম, আমরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে যখন অত্যাচারের নিদর্শন গুলো দেখতাম, কাহিনী গুলো শুনতাম, ও যেন আমাদের চেয়ে অন্যরকম ভাবে অভিভূত হোত। তোমরা আমায় নরমপন্থী

বলে দোষ', প্রত্যক্ষ সব দেখে আর যারা সর্বস্বান্ত হোল তাদের নিজেদের মুখে সব কাহিনী শুনে আমারও চোখে আগুণ জ্বলে উঠত, কিন্তু ওর মুখে চোখে থাকত অন্য ভাব,—একটা ব্যাকুল অসহ্য ভাব, আমরা যে সর্বনাশটা প্রত্যক্ষ করছি বা যে সর্বনাশের কাহিনী শুনছি ও তারচেয়ে ঢের বেশি একটা সর্বনাশ উপলব্ধি করে যেন একেবারে ভেঙে পরছে।

চোখে ওর আগুনও জ্বলত, ওর উপলব্ধ সর্বনাশটা আরও উৎকট বলে চোখের আগুনটাও মনে হোত আরও জ্বালাময়। একদিনকার কথা মনে পড়ে। ভোর হতেই খবর পেলাম মাইল তিনেক দূরে একটা জায়গায় রাত্রে লুটতরাজ হয়ে গেছে। সবাইকে জাগিয়ে দেওয়া হোল, তাড়াতাড়ি বেরুতে হবে, ছেলেটি খবরটা শুনে আমার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল, তারপর জিগ্যেস করলে—'আবার নতুন করে? কেন—হয়েতো গেছে।' বললাম—"মানুষ জানোয়ার হয়ে উঠলে সে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে বলাতো যায় না, নাও, ওঠ সব তোমরা, বেড়িয়ে পড়তে হবে।...আমার দিকে খানিকক্ষণ সেই রকম ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল—যেন ভেবে অন্যায়টার থৈ পাচ্ছে না। পথেও আমায় কয়েকবার থেকে থেকে ঐরকম প্রশ্ন করলে—'দেখুন বরাবর এইরকম করতে থাকবে নাকি?... এখনও না থামলে ওদের উপায় কি হবে ভাবছে না? ভগবান তো আছেন।'...আমায় এমনভাবে সাক্ষী মানবার কারণটা আমি বুঝতে পারলাম, কোন একটা কারণে এমন অসহায় বোধ করছে

যে মানুষের মুখে ভালোমন্দ একটা অভিমত পেলেও যেন অনেকটা স্বস্তি পায়।

ঘর সাত-আট হিন্দুর বাড়ি নিয়ে একটা ছোট্ট গ্রাম—একটা উঁচু জমির ওপর, যেমন ওদিক'কার গ্রাম গুনো হয়, তারপর বিঘে দশেক একটা নিচু মাঠ, তারপরেই বড় একটা গ্রাম, মুসলমানদের বসতি।

পুড়িয়েছে গ্রামটাকে। টাটকা ধ্বংস, তাজা রক্তের মতো আগুনের চাপ এখানে ওখানে জমাট বেঁধে রয়েছে—এক এক জায়গায় হঠাৎ একটা শিখা উঠে আবার তখুনি নিভে যাচ্ছে; গাছগুলো পোড়া ঝল্‌সানো, একটা মাঝারি সাইজের তালগাছের মাথাটা তখনও জ্বলছে, ধ্বংসের জয়পতাকার মতন। একটা পাখির আওয়াজ নেই, একটা মানুষের সাড়া নেই, শুধু একটা পাঁশুটে রঙের কুকুর আগুন ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে যেখানে-সেখানে নাক ঠেকিয়ে খুব ব্যস্তভাবে কি খুঁজে বেড়াচ্ছে।

এর আগে যেখানে-যেখানে গেছি সঙ্গে সঙ্গে কাজ পেয়ে গেছি—হয় সবাইকে ডেকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে, সাহস দিয়ে আবার ঘরবাড়ি ঠিক করে নিতে বলা, নিজেদের কর্মী দিয়ে কাজ সুরু করিয়ে দেওয়া, সাহায্যের জিনিস বিলি করা; না হয় যেখানে আতঙ্ক বড় বেশি, কুড়িয়ে-বাড়িয়ে, গুছিয়ে-সুছিয়ে ক্যাম্পে নিয়ে আসবার ব্যবস্থা করা। এখানে লোক নেই, সুতরাং 'কাজ নেই, তার ওপর ব্যাপারটাও একেবারে সদ্য, ধ্বংসের আসল রূপটা ভালো করে দেখবার যেন সুযোগ আর অবসর দুই পেলাম।

কর্মী ছেলেরা গ্রামের ভেতর ঢুকে পড়েছে, আমি একটা আধপোড়া আমগাছের তলায় যেন স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় পাশের গ্রাম থেকে জন পাঁচেক লোক এসে আমার কাছে দাঁড়াল; সব মুসলমান,—তু'জন বৃদ্ধ, চেহারা দেখে মনে হয় সহোদর ভাই, তু'জন মাঝবয়সী লোক আর একটি ছোট ছেলে, বছর ছয় সাতেকের। কথাবার্তা হোল, চারজনেই খুব আপশোষ করতে লাগল। ওদের গ্রাম পাশের এই ছোট্ট হিন্দু গ্রামটিকে বাঁচিয়ে রেখেছিল এতদিন, তারপর টের পেলে ওদের গ্রামেরও অনেকে উলটে যাচ্ছে, কাল ওদেরই একজন গ্রামের কয়েকজন হিন্দু মাতব্বরকে নিয়ে থানা, প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েৎ আরও কয়েক জায়গায় ঘোরাঘুরি করে, চারিদিকেই সয়তানের এখ্তিয়ার—কেউ মৌখিক একটু সহানুভূতি দেখালে, লোক দেবার চেষ্টা করবে বললে, কেউ তাও নয়—ভেতরে ভেতরে কি সব ব্যবস্থা হচ্ছিল, তারপর রাত্রে হঠাৎ এই কাণ্ড।

কথাবার্তা কইছি, দেখি সেই ছেলেটি গ্রামের ভেতর থেকে একটু মাথা গুঁজে হন্‌হন্‌ করে বেরিয়ে আসছে, খুব অন্যমনস্ক, বেশ খানিকটা এগিয়ে না আসা পর্যন্ত মাথা তুললে না, তারপরই আমার পাশের ওদের ওপর নজর পড়তে চেহারা গেল বদলে, চোখ তুটো হঠাৎ জ্বলে উঠল, আমাদের পেছনেই একটু দূরে তালগাছটা দাঁড়িয়েছিল, তার ছায়াটা চোখে পড়তে সত্যিই মনে হোল জ্বলছে যেন চোখ তুটো, তারপর ব্যাপারটা কি বোঝবার আগেই, কিছু প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়েই সে এসে একেবারে

বৃদ্ধদের মধ্যে যে বড় তার হাতটা খপ্ করে ধরে ফেললে, সমস্ত শরীরটা থরথর করে কাঁপছে, চোখের আগুন যেন ঠিকরে পড়ছে ; হাতটায় একটা টান দিয়ে বললে—'চলুন চলুন দেখবেন কি করেছেন আপনারা ! এখনও সবটা পোড়েনি—মা আর তার কচি ছেলে—চলুন !'

কয়েক সেকেণ্ডের ব্যাপার—মাঝবয়সী লোক দুটোর চোখের ভাব একেবারে গেছে বদলে, আমি একরকম ঝাঁপিয়ে পড়লাম, ছেলেটার হাতে একটা কড়া ঝটকা দিয়ে, তাকে খানিকটা সরিয়ে দিয়ে বললাম—'একি করছ কিরণ।—পাগল হোলে নাকি ?'

সবার সম্বিৎ ফিরতে একটু সময় নিলে ; বৃদ্ধের মুখটা লাল হয়ে গিয়েছিল, সেই আগে ঠাণ্ডা হোল, বাকি ক'জনকে হাতের আড়াল করে রেখে শান্ত কণ্ঠে বললে—'থাক্ থাক্, কি আর হয়েছে —ছেলে মানুষ, মনটা খারাপ হয়ে রয়েছে। আমরা তো করিনি, করেছে যাদের ঘাড়ে সয়তান সওয়ার হয়েছিল। কার ছেলে তুমি ? আগে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না তো।'

ক্যাম্পে এসে ওকে ভালো করে বোঝালাম। একটু বিরক্তি ধরেছিল, মনের কথা খুলেও বললাম কিছু আড়ালে ডেকে—কাগজে লেখালেখি ভিন্ন যে-দেশে এতবড় একটা অত্যাচারেও কাজের সাড়া জাগ্‌ল না—একজন বড় লীডার এসে বিপদের মধ্যে হাত তুলে দাঁড়াল না গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে—দেশের একটা অংশ মার খেলে, একটা অংশ হাঁ-করে দাঁড়িয়ে তামাসা

দেখলে, ঐ ক'টা কর্মী জোগাড় করতে যেখানে হিমসিম খেয়ে যেতে হয়েছে—সেখানে মুসলমান বলেই একটা নিরীহ বুড়োকে নিয়ে টানাটানি করলে কি হবে ? হাজারে একজন হোক, কি লাখে একজন হোক, ভালো লোক তো থাকেই এক আধজন সব জায়গায়, রাগে ওরকম অন্ধ হয়ে পড়লে কার গায়ে হাত দিতে কার গায়ে গিয়ে হাত পড়বে ঠিক আছে ?

সব ব'লে এটাও জানিয়ে দিলাম যে, ওরকম উগ্র মেজাজ নিয়ে কাজ করা চলবে না এই রকম অবস্থার মধ্যে—ক্যাম্পের বদনাম হবে—শুধু শত্রু বাড়বে, যা করতে এসেছি ফল তার ঠিক উল্টা হবে। শেষে এও বললাম—যদি এ ভাবটা না শোধরাতে পারে তো ওর ক্যাম্প ছেড়ে যাওয়াই ভালো।

ছোকরা কাতর হয়ে আমার হাঁটুটা চেপে ধরলে, বললে কথা দিচ্ছে, এবার থেকে সামলে থাকবে, তাড়িয়ে যেন না দিই ওকে।

—সে কাতর-ভাব দেখলে মনে হয় কত বড় বিপুল সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে ওকে যেন বনবাসে পাঠাতে যাচ্ছিলাম !

সেই থেকে ওর চোখের সেই আগুন আর দেখিনি। কিম্বা শুধু একবার শেষবারের মতন দেখেছিলাম, সেকথা পরে বলব। কিন্তু এর পরে একটা নতুন জিনিস ওর মধ্যে ফুটে বেরুল। গোড়ায় বলেছি পাড়াগেঁয়ে হলেও ওর চেহারায় একটা কৃষ্টির, বেশ একটু চিন্তাশীলতার ছাপ ছিল, ঐ ব্যাপারটার পর ওর কথাবার্তায় সেই জিনিসটার পরিচয় পেতে লাগলাম বেশি করে।

এই ঘটনার পরে ওর কাজের দিকটা একটু কমে এল, বোধ হয় পাছে মেজাজ এইরকম হারিয়ে ফেলে এই ভয়ে বাইরে কাজ করতে যাওয়াটা মাঝে মাঝে এড়িয়ে যেতে লাগল। আমাদের ক্যাম্পেই ঘর-ছাড়াদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছিল—যেমন বাইরে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছিল তেমনি জুটছিলও এসে বেশি করে দিন দিন, ও তাদের মধ্যেই বেশি করে কাজ করা আরম্ভ করলে—নেহাৎ যেদিন লোকাভাবে বা অন্য কোন কারণে টান পড়তো সেদিন বেরুত বাইরে। ক্যাম্পের কাজ হালকা, ও বাকি সময়টা ওর চিন্তা নিয়ে কাটাত—চারিদিকে যা হচ্ছে, হয়ে গেছে তার ওপর ওর মনের প্রতিক্রিয়া। আমি ফিরে এলে আমার কাছে এসে হাজির হোত, জলটা এগিয়ে দেওয়া কি গোটাকতক পান সেজে দেওয়া এই রকম সামান্য একটু আধটু যা দরকার সেগুলো জুগিয়ে ওর আমায় সেবা করার স্পৃহাটা মেটাতো, তারপর আমি একটু গড়াতাম আর ও গল্প করে যেত—এই যা হচ্ছে, হওয়া উচিত তাই নিয়ে ওর মন্তব্য—বলার মধ্যে একটা গভীর বেদনার সুর থাকত, অন্য প্রায় সবার আলোচনাতেই যেমন একটা আক্রোশের ভাব দেখতাম, সেটা থাকত খুব কমই। হ্যাঁ, এইখানেই আর একটা কথা বলে রাখি—ওর কথাবার্তায় মার্জিত ভাব দেখে, ঝোঁকের মাথায় যা এক আধটা ইংরিজি কথা বেড়িয়ে পড়ত তার উচ্চারণের ভাব দেখে একদিন কতকটা জেদ করেই একটু সবিস্তারে ওর পরিচয় চাইলাম। টের পেলাম ছেলেটি গ্রামের স্কুলেই ম্যাট্রিকের ছাত্র, ভালো ছাত্রই

ছিল, এই সব দেখে শুনে পড়ায় মন বসছিল না বলে পালিয়ে এসেছে। ওর বাপ চিকিৎসা ব্যবসা করেন, এক কাকা প্রফেসার, একটি বড় ভাই কলেজে বি-এ পড়ে।...মিনিস্ট্রির কুকীর্তি নিয়েই হতো বেশি কথা—'আচ্ছা একটা মিনিস্ট্রি দুর্ভিক্ষ ঘটালে—অমন দুর্ভিক্ষ—সারা ভারতবর্ষে যার মতনটি এর আগে হয় নি। পরের মিনিস্ট্রির সেইটেই সামলানো উচিত তো? তা সে দাঙ্গাবাজি নিয়ে রইল! এ কী? ধর্ম ধর্ম করে চীৎকার করে পরের বিভ্রম ঘটানো যায়, তাই বলে ভগবানকেও তো বিভ্রান্ত করা চলবে না। প্রমাণ দেখুন, যে দুর্ভিক্ষটা ঘটালে তাতে শেষ হোল ওদের ধর্মের লোকই বেশি—বাংলায় যদি মুসলমানই বেশি হয় তো তাদেরই বেশি না মরে যে উপায় নেই এটা তো বোঝা উচিত ছিল। বুঝবে না; আশ্চর্য! কি যে হবে আমি বুঝতে পারি না।'

একদিন বললে—'এক একবার কি মনে হয় জানেন?—আমরা ছেড়ে দিয়ে চলে যাই, ওরা যেমন বলছে সাহায্যের দরকার নেই, আমরাই ঠিক করে নোব—না হয় দেওয়া যাক্ একটা চান্স।'

বললাম—'কথা রাখবার নমুনা তো দেখছ? তা ভিন্ন অনেক জায়গায় তো রিলিফ ক্যাম্প পড়েও নি এখনও, শুনছ ত সেসব জায়গা থেকে খবর কি সব আসছে?'

ছোকরা খুবই মুসড়ে গিয়ে একটু চুপ করে রইল, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—'তা তো বটেই, অথচ আমাদের স্কুলের মৌলুবি সাহেবকে একদিন হলে লেকচার প্রসঙ্গে বলতে

শুনেছি—মুসলমান কথাটার মানে মুসল্লম ইমান, অর্থাৎ ইমান যাদের পূর্ণ; এই তার নমুনা ? ওদের কেউ ভাবছে না কেন যে সমস্ত জাতটা কোথায় তলিয়ে যাচ্ছে ?'

সমস্যার দুশ্চিন্তাটাতেই একটু চুপ করে রইল, তারপর বললে—'না, আমি সেকথা বলছি না, আমি বলছি আমরাই করছি-কর্মাচ্ছি বলে ওরা বোধ হয় বুঝতে পারছে না ওদের পাপটা কত ভীষণ—সেটা না বুঝতে পারলে তো ওদের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হবে না, আর প্রায়শ্চিত্ত ওদের দরকার, নৈলে জাত হিসেবে শেষ হয়ে যাবে ওরা। সে দিক থেকেও কি ব্যাপারটা দেখা উচিত নয় আমাদের ? আপনি কি বলেন ?'

কথাটা উঁচুদরের হোলেও আমার সেদিন হাসি পেয়েছিল, বললাম—'একটা সম্প্রদায়ের শুধু প্রায়শ্চিত্ত করবার সুযোগ করে দেবার জন্যে যদি অন্য সম্প্রদায়কে শেষ হয়ে যেতে দিই কিরণ, তো আমাদের প্রায়শ্চিত্তের কি উপায় থাকবে বলো ?' একটু সুবিধে পেলে তো দেখছ এখনও ওরা অত্যাচারেরই চূড়ান্ত করে ছাড়ছে।'

ছোকরা একটু লজ্জিত হয়ে যেন আরও অসহায় হয়ে পড়ল, বললে—হ্যাঁ, তাওতো বটে···যাক, ভগবান যা করবেন তাই হবে—ভেবে কিছু উপায় দেখি না।'

আর এক দিনের কথা, ক্যাম্পে ফিরে আমার সেদিন

কয়েকজনের সঙ্গে একটু কাজ ছিল—হিসেব, চিঠিপত্র, এইসব। লক্ষ্য করলাম একখানা কাগজ হাতে নিয়ে ছেলেটি চুপ করে এক ধারে বসে আছে। কাজ শেষ হলে সবাই চলে গেলে আস্তে আস্তে উঠে এসে কাগজটা আমার হাতে দিয়ে বললে—'এইখানটা পড়ুন।'

একটা লীগপন্থীদের দৈনিক কাগজ,—চোখরাঙানি—যেখানটা দেখালে সেখানটায় এসে উচ্ছ্বাস খুব ফেনিয়ে উঠেছে—যেমন হয়, এখানে আর কুলুচ্ছে না, তৈমুরলঙ্গকে, চেঙ্গিজ খাঁকে, এনে হাজির করেছে। আমি সমস্তটা পড়ে একটু হেসে কাগজটা ফিরিয়ে দিয়ে বললাম—'এতো হচ্ছেই, নতুন কথা কি?'

ওর মুখে সেই নিরুপায়ের দুশ্চিন্তা, বললে—'আমি সেকথা বলছি না,—লেখেই তো এভাবে, আমার একটা কথা স্ট্রাইক্ করে বড়—দেখুন আর সব জাতই শপথ করে তাদের শ্রেষ্ঠ মানুষদের নিয়ে, ক্রিশ্চানরা ক্রাইষ্ট, হিন্দুরা শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্য, বৌদ্ধেরা বুদ্ধ, এরা কাদের নিয়ে শপথ করছে না,—তৈমুর, চেঙ্গিজ—কোনও ষ্টাণ্ডার্ডেই যাদের দস্যুর ওপরে স্থান দেওয়া যায় না, আর মানুষ যতই সভ্য হবে, যাদের সম্বন্ধে ধারণা আরও ঘৃণিতই হয়ে আসবেই, একদিন মুসলমানকেও যাদের কনডেম্ করতেই হবে। কৈ, স্বধর্মী বলে মুসলমানদের বাদ দিয়েছে বলে ইতিহাসে কোন প্রমাণ আছে?

এই রকম ধরণের সব কথাবার্তা, আলোচনা। ক্রমে লক্ষ্য করতে লাগলাম যতই দিন যেতে লাগল, ক্যাম্পে লোক জমতে

লাগল, কাজ বেড়ে যেতে লাগল, আরও জটিল হয়ে উঠতে লাগল, দরকার পড়ল বেশি লোকের, বেশি খাটুনির—ওর কাজের ভাগ যেতে লাগল কমে ! যতোই বেশি দেখতে লাগল, যতই শুনতে লাগল, ও যেন মুসড়ে যেতে লাগল ; ভাবে, মনে মনে গোমরায়, ফুরসৎ পেলে আমার সঙ্গে ঐ ধরণের আলোচনায় লেগে যায়। দু'একবার কাজের তাগাদা দিলাম একটু, বিশেষ কোন ফল না পেয়ে ওর মনের স্বাস্থ্য নিয়েই বেশ একটু ভয় পেয়ে গেলাম—এরকম নিষ্কর্মা হয়ে এইসব অত্যাচারের ব্যাপার চাক্ষুষ করতে থাকা, গল্প শুনতে থাকা আর তাই নিয়ে খালি ব্রুড্ করা তো ভাল নয়। ঠিক করলাম ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দোব। আমার কাজও অনেক গেছে বেড়ে, বলব বলব করে দুটো দিন কেটে গেল, এমন সময় হঠাৎ একটা ব্যাপার ঘটল—

অতুল বাইরে একটু দূরে একটা কাজে গেছল, গাড়ি থেকে নেমে টিকিট দিয়ে স্টেশন থেকে বেরুবে ; গেটের কাছে ভিড় থাকায় একটু দাঁড়িয়ে যেতে হোল। গেটের বাইরেও কতকগুলি লোক দাঁড়িয়ে ছিল, ভেতরে আসবে, অতুলের হঠাৎ একটি বোরখাপরা মেয়ের দিকে নজর গেল আর ঠিক সেই সময়টিতেই মনে হোল মেয়েটি ভেতর থেকে একটু টান দিয়ে বোরখাটা পায়ের গোছের কাছে যেন একটু তুলে ধরলে। দুই পায়েই আঙুলের কিছুটা ওপর পর্যন্ত মুসলমানি ঢঙে চিত্রবিচিত্র করে মেহদির দাগ। মেয়েটি যেন আর একটু তুললে বোরখাটা। সঙ্গে সঙ্গে

অতুলের মনে হোল সেই আঁকা-বাঁকা রেখার মধ্যে দুটো অক্ষর রয়েছে। অতুলের উপস্থিত বুদ্ধিটা বেশ প্রখর, পাছে কারুর মনোযোগ আকর্ষণ করে এই জন্যে চোখটা ফিরিয়ে নিলে, ভিড়ের ঠেলাঠেলি চলেছে, তারই মধ্যে একটু এগিয়ে আবার আড়ে চোখ নামিয়ে দেখলে লেখা রয়েছে 'হিন্দু'—রেখাগুলোর সঙ্গে একটু মেলামেশা করে, তবে ভুল হবার নয়,—অক্ষরগুলো ওরই মধ্যে বেশি স্পষ্ট। প্রায় সবাই মুসলমান, শুধু স্টেশনমাষ্টার হিন্দু, পাশেই জন পাঁচেক পুলিস নিয়ে একজন সাবইন্‌স্পেক্টার ক্যাম্প ফেলে আছে, কিন্তু রক্ষকের চেয়ে ভক্ষক হিসেবেই তার নাম হয়েছে বেশি। এইখানে জানাজানি করে ফল যে ভাল হবে এমন মনে হোল না অতুলের। মনে পড়ল পরের স্টেশনেও একটি ক্যাম্প আছে আর সেখানে দুর্নামের জন্যে একজন মুসলমান অফিসারকে সরিয়ে একজন হিন্দুকে আনা হয়েছে, পুলিসের মধ্যেও হিন্দু আছে। অতুল নির্লিপ্তভাবে টিকিট দিয়ে বেরিয়ে এল, তারপর কাউণ্টারে গিয়ে পরের স্টেশনের টিকিট চাইলে। সেইখানে দাঁড়িয়েই দেখলে একটি লোক নিজে গাড়িতে উঠে মেয়েটিকে হাত ধরে তুলছে, মুখে লম্বা দাড়ি, লুঙ্গি পরা, গায়ে কুর্তার ওপর একটা রুমাল ফেলা ; পেছনেও একটা লোক দাঁড়িয়ে, ছোকরা গোছের, তার মুখটা আর দেখতে পেলে না, একটু সাজগোজ থাকলেও মনে হয় চাষাভুষো মানুষ। গাড়ি ছাড়ার ঘন্টি দিয়েছিল, টিকিটটা নিয়ে অতুল দুখানা গাড়ি বাদ দিয়ে একটা থার্ডক্লাসে উঠে বসল।

পরের স্টেশনেও স্টেশনমাষ্টার হিন্দু, রিলিফ উপলক্ষে জানাশোনা আছে, নেমেই ঘরে গিয়ে তাঁকে একটু পাশে ডেকে গাড়িটা থামিয়ে রাখতে বলে ক্যাম্পে চলে গেল, স্টেশন থেকে মিনিট তিনেকের রাস্তা।

পুলিস যখন এল, সে-লোক দুটোকে আর পাওয়া গেল না, গাড়ি ছাড়ে না দেখে তারা সন্দেহ করে সরে পড়েছে। মেয়েটির বোরখা খোলা হোল, মুখের মধ্যে কাগজ ঠোসা, তারওপর শক্ত নেকড়া দিয়ে মাথার পিছনে গেরো দিয়ে বেশ শক্ত করে বাঁধা। অতুল বললে প্রায় ঘণ্টাখানেক পর্যন্ত মেয়েটি কোন কথা কইতে পারে নি, জিভ অসার হয়ে গেছল। তারপর বাড়ির কথা বললে; আমাদের ক্যাম্প থেকেই মাইল পাঁচেক দূরে রূপ্সি বলে একটা গ্রামে। বাড়িতে মেয়ে-পুরুষে ছেলেয়-বুড়োয় এগার জন লোক ছিল, চারজনকে নিজের চোখের সামনেই মরতে দেখে। তারপর ওকে ধরে নিয়ে আসে, আর কিছু খবর জানে না। এজাহার দিয়ে তিনজন বন্দুকওলা পুলিস সঙ্গে দিয়ে অতুলের সঙ্গে মেয়েটিকে আমাদের ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিলেন সাব-ইন্‌স্‌পেক্টার। অতুলের জন্যে ভাবনায় পড়ে গিয়েছিলাম, রাত্রি প্রায় আটটার সময় অতুল ক্যাম্পে এসে পৌঁছল।”

সোমেন একটু চুপ করিল। সুখময় বলিল—“না হয় এই পর্যন্তই থাক সোমেন, শোনাটাও যেন মৃত্যুযন্ত্রণা হয়ে দাঁড়াচ্ছে; এই সব পিশাচদের সম্বন্ধেও তুমি মনটা কি করে ঠাণ্ডা রাখ বুঝতে পারি না।”

মৃত্যুঞ্জয় বলিল—"না, বলো, বেশ লাগছে ; যে কাজটা করে বেশ আটঘাট বেঁধে করে; আমাদের যেন সবই যায় ভেস্তে, শেখবার আছে এদের কাছে।"

সুখময় বলিল—"শেখবার আর জিনিস পেলে না ?—সাকরেদি করবারও আর গুরু পেলে না ?"

মৃত্যুঞ্জয় বলিল—"অবস্থা বুঝে অনুরূপ গুরু খুঁজে নিতে হয়; এতো তবু হাতের কাছে নিজেদের মধ্যেই পাচ্ছি, দেবতাদের এক সময় দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কাছে ধর্ণা দিতে হয়েছিল, আর তা নিশ্চয় ব্রহ্মবিদ্যা শেখবার জন্যে নয়।"

সোমেনের যেন এসব তর্কাতর্কিতে কান ছিল না, বাহিরে চাহিয়া ছিল, দৃষ্টিকে ফিরাইয়া আনিয়া আবার সুরু করিল—"মেয়েটিকে নিয়ে এল আমার সামনে। চোখে এক অদ্ভুত ভাব, অমনটি আমি দেখিনি কোথাও—ভয়ে এমন হয়ে রয়েছে যেন ভরসাকেও বিশ্বাস করতে পাচ্ছে না। থেকে থেকে যেন ভেতরে ভেতরে কেঁপে ওঠে, চারিদিকে চায়, প্রশ্ন করে 'কেউ এসে পড়বে না তো—অঁ্যা ?' তারপর আবার নিজের কাহিনী বলে চলে। শেষ হলে যতটা সম্ভব সাহস দিয়ে বললাম—'এখানে কোন ভয় নেই, হিন্দু পুলিস, তারা যতটা সম্ভব খোঁজ নেবে, আমরাও কাল সকাল থেকেই চেষ্টা করব, ক্যাম্পে তোমার জন্যে জায়গা ঠিক হয়ে গেছে, তুমি এখন মুখ হাত ধুয়ে কিছু খেয়ে নাও আগে।'

মেয়েটি ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল আমার দিকে, বললে—'আমি এখন খাব না তো।'

জিগোস করলাম—'কেন ?'

মেয়েটি একবার চারিদিকে চেয়ে দেখে আমার মুখের পানে চাইলে; কিছু বলতে চায় বুঝতে পেরে আমি সবাইকে সরিয়ে দিলাম, মেয়েটি আর একবার চারিদিকে চেয়ে বললে—'আপনি আমার বাবা—কাকে বলি,—আমার জাত-ধর্ম কিছু নেই—আমায় যা তা খাইয়েছে—আর—আর...'

হঠাৎ আমার পা দুটো জড়িয়ে পায়ের ওপর মাথা চেপে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল, তারই মধ্যে ভাঙা ভাঙা গলায়—'আমার সিঁদুর—আমার কপালের সিঁদুর—আমার তো কোন দোষ নেই—আমায় প্রাশ্চিত্তির করিয়ে আগে সিঁদুর দিন আমায়—কি প্রাশ্চিত্তির আমার ? আমার কি দোষ ?'

আমি হাত ধরে তুলে বসালাম, বললাম—"প্রায়শ্চিত্তের তো দরকার কিছুই নেই মা, ব্রাহ্মণেরা বিধান দিয়েছেন, মহাত্মা গান্ধীজিকে জানো নিশ্চয়—তিনি বলেছেন এ অবস্থায় কিছুমাত্র প্রায়শ্চিত্তের দরকার নেই। সিঁদুর তুমি পাবে, এ ক্যাম্পে অনেক সধবা মেয়ে এসে আছেন সিঁদুরের অভাব হবে না, আমি এখুনি ব্যবস্থা করছি। কিন্তু..."

মেয়েটি যে বুদ্ধিমতি তা তার পায়ে মেহদির সঙ্গে পরিচয় দেওয়ার ব্যবস্থা থেকেই বোঝা যায়। কিন্তু বলে আমি থেমে যেতে বললে—'আমি বুঝেছি কি বলতে চান আপনি। আমার স্বামী বেঁচে আছেন, নিশ্চয় বেঁচে আছেন তিনি—চারজনের মধ্যে তাকে মারে নি—তারপরে জানিনা—তবে বেঁচে

নিশ্চয় আছেন—হিন্দু মেয়েরা টের পায়—আমায় সিঁদুর দিন আগে।'

জুতো সুদ্ধ্ পা দিয়ে ঘসে ঘসে কপালের সিঁদুর মুছে দিয়েছিল ওরা, কাফেরের ধর্মের জিনিস হাত দিয়ে ছুতে নেই কিনা—সিমন্তের চুলগুলো উঠে গেছে, সমস্ত কপালটায় ঘা হয়ে গেছে। সিঁদুর আনিয়ে দিতে বুকে ছুঁইয়ে বাঁ-হাতের যেখানে শাঁখা-নোয়া থাকত সেখানটা ছুঁইয়ে দেবতার নির্মাল্যের মতন কয়েকবার কপালে ছুঁইয়ে আস্তে আস্তে সেই ঘায়ের ওপর পরলে, তারপর...”

সুখময়ের যেন আর ধৈর্য রহিল না, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল “মৃত্যুঞ্জয়, শেখবার মতন আরও কিছু শুনতে চাও নাকি?”

মৃত্যুঞ্জয় একটু হাসিয়া বলিল—“তুমি চটছ; কিন্তু এটা তো ঠিক যে এ-জিনিসটা দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কাছেও পাওয়া যেত না।”...

সুখময় একটু শ্লেষের কণ্ঠে বলিল—“তারপর কি আছে বের করো সোমেন, মৃত্যুঞ্জয়ের সাধ মিটছে না।”

সোমেন বলিল—“সাধ মিটবে কিনা বলতে পারি না, তবে এর পরে যা আছে তাতে শেখবার যে আছে অনেক কিছু সেটা তোমায় পর্যন্ত মানতে হবে। সেই ছেলেটির কথায় ফিরে আসা যাক। পেছনে একজায়গায় বসে শুনছিল সব কাহিনী। তারপর থেকে কিন্তু একেবারে চুপ করে গেল। একরকম কারুর

সঙ্গে কোন কথাই বলে না, খেলেও না ভাল করে, ক্যাম্পের চারিদিকে যেন অস্থির হয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল, তারপর রাত যখন নিশুতি হয়ে এসেছে, আমার বিছানার পাশে এসে ডাকলে—'ঘুমুচ্ছেন আপনি ?'

ঘুমের সঙ্গে আড়াআড়ি চলছে আমার তখন, জিগ্যেস করলাম—'কেন ?'

'ঐ মেয়েটিকে আমায় দিন, আমি সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে মার মতন করে রাখব। আপনার পা ছুঁয়ে বলছি এই।'

বললাম—'সেটা কি সম্ভব কিরণ ? উনি রাজি হবেন কেন ? তা ভিন্ন ওঁর সবাইয়ের খোঁজ নিচ্ছি আমরা। সব ছেড়ে তোমাদের বয়সের কথাই ভাবো না—তোমার মনের পবিত্রতা দুনিয়া কি বিশ্বাস করবে ?'

যেন নিতান্ত নিরুপায় হয়ে বললে—'তাহলে প্রায়শ্চিত্ত হবে কি করে ?'

বললাম—'প্রায়শ্চিত্তের তো দরকার নেই।'

একটু যেন অপ্রতিভ হয়ে উত্তর করলে—'না, না, ওঁর প্রায়শ্চিত্ত কিসের ?—উনি কেন করতে যাবেন ? তবে কাউকে তো করতে হবে এর জন্যে ? কেউ যদি না করে চলবে কেন ?'

অদ্ভুত চোখের ভাব, অসংলগ্ন কথা, আমি ভয় পেয়ে গেলাম। তবে সেটা প্রকাশ না করে বললাম—'তুমি এখন যাও একটু, ঘুমোও গিয়ে, আমারও এখন বড্ড ঘুম পেয়েছে। বেশ, কাল

মেয়েটিকে বলে দেখব। তা ভিন্ন ও যদি আবার সংসার পাততে পারে সেখানে তো তুমি থাকতে পার, নয় কি ?'

মুখটা ওর উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বললে—'হ্যাঁ, বেশ ভালো কথা বলেছেন, তাও তো হয়।'

বললাম—'যাও, শোওগে।'

ঠিক করলাম পরদিনই ওকে বাড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে ; হচ্ছে-হবে করে বড্ড দেরি করে ফেলেছি ; মাথাটা বুঝি গেলই বিগড়ে।

তার পরদিন সকাল থেকে ওর দেখা নেই। মনটা বড্ড খারাপ হয়ে রইল। চারিদিকে লোক পাঠালাম খোঁজ করতে, কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। মাইল তিনেক দূরে স্টেশন, সকাল আটটায় আর সাড়ে নটায় দুদিকে দুটো গাড়ি—যতদূর খবর পাওয়া গেল কোন গাড়িতে যায় নি। যাকে পাঠিয়েছিলাম তাকে বলাই ছিল বিকেল পর্যন্ত থাকবে, ঐ সময় দিনের শেষ গাড়ি, সেইটে দেখে স্টেশনমাষ্টারকেও ভালো করে বলে চলে আসবে। সে এসে খবর দিলে ও পথে যায়নি। মনটা অত্যন্ত খারাপ হয়ে রইল, ক্যাম্পের কর্মীদের শত্রু চারিদিকে, একটা ছটকে পড়লেই বিপদ, কী যে হয়েছে বুঝতে আর বাকি রইল না। অবসন্ন মনে কম্বলের ওপর গিয়ে শুয়ে পড়েছি, এমন সময় বাইরে হঠাৎ একটা গোলমাল উঠল—'আমি কিরণ—বলছি আমি কিরণ, যেতে দিন আমায়—দিন যেতে, বড্ড দরকার—যেতে দিন আমায়…'

একটা ধস্তাধস্তি—মিনিট খানেকের, আমি উঠে বসেছি, এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে একটা ছেলে আমার সামনে এসে দাঁড়াল, একটু ধোঁকা, তারপরেই লালটেমের আলোয় চিনলাম সেই ছেলেটাই। তবে চেনায় অনেক বাধা ছিল—লুঙ্গিপরা, হাতে একটা টার্কিস ক্যাপ দোমড়ানো, ফতুয়ার নিচে পৈতের গোছাটা নেই, আর নেই সেই টিকিটা—সেটা ছিল বেশ নজরে পড়বারই মতন।

হাপরের মতো হাঁপাচ্ছে, মুখচোখ বসা, দৃষ্টি একেবারেই পাগলের মতন।

কয়েক সেকেণ্ড কথাই বেরুল না, তারপর বললে—'সত্যিই আমি কিরণ—বিশ্বাস করুন, এই বেশ করে ওঁর গাঁয়ে গিয়েছিলাম—কাল যিনি এসেছেন—ওরা আসছে—মস্ত দল নিয়ে—এসে পড়বে এবার—কি হবে?—ওঁকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে···সব চুপ করে রয়েছেন কেন?—কি হবে—কি করতে হবে করুন—পুলিসে খবর দিয়ে এসেছি—আসবে না—বললে আসছি—জানি আসবে না—কি হবে?—বিশ্বাস করছেন না?—আমি কিরণই—সত্যি কিরণ—সত্যি আসছে ওরা—এসে পড়ল বলে।'

এ ভুলটা আমাদের হওয়া উচিত ছিল না, ছেলেটিকে সমস্ত দিন না পাওয়ার জন্যে হয়ে গেছে, মনটা বড় অন্যমনস্ক হয়েছিল। যাই হোক তাড়াতাড়ি লেগে গেলাম ব্যবস্থায় সবাই, দু'জন ছুটল পুলিস ক্যাম্পের দিকে, বাকি সবাই বাঁশ লাঠি যা হাতের কাছে

পেলে নিয়ে, দু'একটা মশালের ব্যবস্থা করে, আশ্রিতদেরও মধ্যে মেয়েদের সব একত্র করে, বাকি সবাইকে যতটা সম্ভব সশস্ত্র করে তোয়ের হোতে হোতে হঠাৎ একটা শব্দ উঠল 'আল্লা হো আকবর!' আমাদের ক্যাম্পের প্রায় শ'তিনেক গজ দূরে একটা পুকুর ঘেরে ঘন আমকাঁটালের বাগান ছিল, সঙ্গে সঙ্গে তাতে পাঁচ-সাতটা মশালের আলো জ্বলে উঠল, তারপরই সেগুলো ছুটল আমাদের দিকে।

তারপর যা হোল সেটাকে খণ্ড-যুদ্ধের কম কিছু বলা যায় না। আমার এই কপালের দাগ সেইদিনই অর্জন করা, পাঁজরার নিচেও একটা আছে; পড়ল অনেকে, তবে দু'পক্ষেই, কিন্তু এটাও ঠিক যে আমরা সেদিন মুছে যেতাম—কর্মীদের বেশি ভাগই ছেলেছোকরা, এসব জিনিসে অনভ্যস্ত, আশ্রিতরা তো আরও অসহায়—সময়ও পাওয়া যায় নি তোয়ের হবার।

কিন্তু হঠাৎ সামলে গেল—ছেলেটি ভুল বলেছিল—খুবই সম্প্রতি পুলিসের আচরণের জন্যে আন্দোলনটা জোর হয়ে ছিল —অতটা আর সাহস করলে না ওরা; জনচারেক নিয়ে পৌঁছে গেছল দারগা, একটা রাউণ্ড বন্দুক চালাতেই কয়েকটাকে রেখে ওরা পালিয়ে গেল।

ঠাণ্ডা হলে হিসাবের পালা চলল। বেশিভাগের চোটই লেগেছে, মরেছে শুধু অতুল: বড় সাহসী ছেলে ছিল, মোহাড়াটা নিতে গিয়েছিল নিজের বুক পেতে। তার রক্তমাখা দেব দেহটা বুকে জড়িয়ে ধরতে যাব এমন সময় নরু বলে একটি ছেলে

হন্তদন্ত হয়ে এসে আমার হাতটা ধরে বললে—"চলুন শীগ্‌গির চলুন, কিরণ আপনাকে ডাকছে—শীগ্‌গির—আর বেশিক্ষণ নেই।"

গিয়ে দেখি পড়ে আছে, পাঁজরার নিচে একটা ধারাল অস্ত্রের ঘা, হাত দিয়ে সবটা ঢাকতে পারেনি, হাতটা ছাপিয়ে তাজা রক্ত নিচের মাটির খানিকটা পর্যন্ত দিয়েছে রাঙিয়ে। অসহ্য বেদনায় মুখটা গেছে সিঁটকে, বিকৃত হয়ে।

একটু ঠাহর করে দেখে আমায় চিনলে, বললে—'এসেছেন আপনি—আর সময় নেই—আমি মুসলমান—কিরণ নয়—সামেদ—কি হবে?—কি হবে?—কে প্রায়শ্চিত্ত করবে?—ওদের মার্জনা—বুঝছে না কেন ওরা?'

আমার গলাটা এমন বদ্ধ হয়ে পড়ল যে আশ্বাসের একটা কথা বলতে পারলাম না। আমার গা বেয়ে গড়াচ্ছিল আমার নিজের রক্ত, তার সঙ্গে মিশেছিল অতুলের রক্ত, আমি সেই অবস্থায় সামেদের রক্তমাখা দেহটা বুকে করে ধরলাম জড়িয়ে, তখনও বোধ হয় প্রাণটা ছিল সে-দেহের মধ্যে।

"ওকি, চোখে হাত কেন? তোমাদের দুজনের চোখেই এক সঙ্গে কিছু পড়ল নাকি সুখময়?···অভিমত একটা চাই যে আমার।"

সত্যাগ্রহী

যুবকটি আসিয়া না পড়িলে ঘটনাটুকুর সত্যরূপ আমার নিকট অপ্রকাশই থাকিয়া যাইত; কিন্তু একথাও নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারি সেজন্য আমার মনে কোন খেদ থাকিত না, কেন না মিশিরজী তাহাকে যে কাব্যরূপ দিয়াছিলেন সেটাও কম মোহনীয় ছিল না আমার পক্ষে।

মিশিরজী ছাপরার একজন সাকলদ্বিপী কবিরাজ, বেশ হাতযশ আছে; কিন্তু এইটিই তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়, তিনি সঙ্গীতজ্ঞ এবং তদুপরি কবি; এদিকে খদ্দরধারী, দেশের কাজের সঙ্গে অল্পবিস্তর যোগ আছে। আমার সঙ্গে পরিচয়টা আকস্মিক, যখন শুনিলেন আমিও একজন সাহিত্যসেবী, আবার হিন্দী-ভাষারও 'প্রেমী', মিশিরজী বেশ একটু আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন; তাহার পর তিনিও আসেন আমিও যাই, কবিতা শোনান, আর আপশোষ করেন—বাগ্‌দেবীর সেবা করিয়া তাঁহার সাধ মিটিল না এ জীবনে। ভিতরকার কথাটা এই যে মিশিরজী একটি মহাকাব্য লিখিতে চান, ইতিহাস বা পুরাণের কোন কাহিনী লইয়া নয়, সে সব তো পুরানো আর বিরস হইয়া গেছে, নূতন কিছু ঘটুক পৃথিবীতে, আর সেই নূতনকে তিনি মহাকাব্যে রূপ দিন, এই তাঁর অন্তরের বাসনা। সেটা আর পূর্ণ হইতেছে না।

এবার গেলাম অনেক দিন পরে, এর মধ্যে কলিকাতার

হত্যাকাণ্ডের প্রথম দফা গেছে, নোয়াখালি গেছে, বিহারের জেরও প্রায় মিটিয়া আসিয়াছে। মিশিরজী আপ্যায়িত করিয়া বসাইলেন, বলিলেন,—"এবারে অনেকদিনের অদর্শন গেল মুকুর্জিবাবু।"

বলিলাম—"হ্যাঁ, দেশে একটু বিলিব্যবস্থা করতে গেছলাম, দেখলেনই তো কি কাণ্ডটা হয়ে গেল, বিহারও তো বাদ গেল না।"

মিশিরজী মুখটা একটু বিষণ্ণ করিয়া লইলেন, কিন্তু তাহারই মধ্যে কোথায় একটু স্মিতহাস্যের রেশ রহিল লাগিয়া, বলিলেন—"হ্যাঁ মুকুর্জিবাবু, বড় দুঃখের কথা, যে-বিহারকে মহাত্মাজীর সবচেয়ে প্রিয় জায়গা বলা হয়…"

চুপ করিয়া মুখটা একটু নিচু করিলেন, কিন্তু লক্ষ্য করিলাম সেই স্মিতহাস্যটুকু ধীরে ধীরে যেন প্রসার লাভ করিতেছে। এক সময় মুখটা তুলিয়া বলিলেন—"একটা কথা কিন্তু মুকুর্জি-বাবু, আমি আমার মহাকাব্যের খোরাক পেয়েছি এতদিনে। ঘটনাগুলো খুব দুঃখের নিশ্চয়, কিন্তু এসব দৈব ব্যাপারের ওপর যখন কারুর হাত নেই তখন এ থেকে কি উঠল সেইটিই কি আসল কথা নয়? সমুদ্রমন্থনে নষ্টই হোল বেশি, কিন্তু উঠলেনও তো লক্ষ্মী…আমি সেই দিক থেকে বলছি—কষ্টটা অবশ্য আমারও কম নয়। আপনি কি বলেন?"

বলিলাম "দুঃখের মধ্যে দিয়ে ভগবান কল্যাণকে আনেন বলেই তো সে-দুঃখ আমাদের সহনীয় হয় মিশিরজী।"

মিশিরজীর যেন একটা সঙ্কোচ কাটিল, বলিলেন—"তাহলে

শুনুন মুকুর্জিবাবু, আমি আপনাকে নিছক ঘটনাংশটাই বলছি, সেইটুকুর চারিধারে আমার কাব্যটা উঠবে গড়ে।”

একটু চুপ করিলেন, তাহার পর গবাক্ষপথে একটু বাহিরের দিকে চাহিয়া মনে মনে বক্তব্যের প্রথমাংশটুকু যেন একটু গুছাইয়া লইয়া আরম্ভ করিলেন—“জায়গাটার নাম স্বরূপগড়। সারণ জেলা, তবে একেবারে চম্পারণের লাগোয়া। পূবদিকে দিগন্তবিস্তৃত নারায়ণী নদী, তাই থেকেই একটা সুঁতি বেরিয়ে অর্ধচন্দ্রাকারে প্রায় দশ বারো মাইল লম্বা আর মাইল তিন চারেক চওড়া একটা চাকলা ঘিরে পশ্চিম দিক দিয়ে বেরিয়ে গেছে। এই সুঁতিটাই নারায়ণীর পুরনো খাত। এর মাঝের এই জমিটায়…”

এই সময় যুবকটি আসিয়া প্রবেশ করিল, দীর্ঘাঙ্গ, টকটকে রং, আগাগোড়া খদ্দরপরা। গোড়াতেই বাধা পড়ায় মনে হইল মিশিরজীর মুখটা একটু যেন কুঞ্চিত হইল, তখনই সেটা সামলাইয়া লইয়া প্রশ্ন করিলেন—“কি দরকার আপনার?”

“আপনার কাছেই দরকার।”

“বাঙ্গালী বাবুর সঙ্গে আমার একটু কথা হচ্ছে; দেরি হলে ক্ষতি হবে?”

“না…ক্ষতি নেই। আমি বাইরে থেকে আসছি, ফিরতে হবে; তবে আমার গাড়ির এখনও ঘণ্টা তিনেক দেরি আছে।…”

বাইরের বারান্দার দিকে একবার চাহিয়া বলিল—“বাইরেই বসি তা হলে আমি?”

মিশিরজী এক নজরে যুবকটির আপাদমস্তক একবার দেখিয়া লইয়া মুহূর্তমাত্র কি যেন একটু ভাবিয়া লইলেন, তাহার পর বলিলেন—"না, বাইরে বসবেন কেন? ভেতরেই বসুন ওই চেয়ারটায়, কথা আমাদের এমন কিছু গোপনীয় নয়!···আপনিও ত দেখছি খদ্দরধারী।" একটু হাসিলেন; মনে হইল কাব্য-বিষয়ের আর একজন উপযুক্ত শ্রোতা পাইয়া যেন হৃষ্টই হইয়াছেন।

যুবক চেয়ারটিতে গিয়া উপবেশন করিল।

মিশিরজী আমার দিকে ফিরিয়া আবার শুরু করিলেন—"হ্যাঁ যা বলছিলাম—নারায়ণীর পুরনো আর নূতন খাতের মাঝখানের এই জমিটায় ছাড়া-ছাড়া কতকগুলো গ্রাম আছে; তার মধ্যে একটির নাম বললাম আপনাকে, এইখানে বাবু রঘুবীর সিং-এর বাড়ি···"

যুবক হঠাৎ প্রশ্ন করিল—"কোন্ রঘুবীর সিং?"

এই দ্বিতীয় বাধায় মিশিরজীর মুখটা একটু স্পষ্টভাবেই কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, একটু চুপ করিয়া গেলেন। ব্যাপারটি অপ্রিয় হইয়া ওঠে দেখিয়া আমিই বলিলাম—"উনি স্বরূপগড়ের বাবু রঘুবীর সিং-এর কথা বলছেন···"

মিশিরজীর বিরক্তিটা তখনও কাটে নাই, একটু ব্যঙ্গের হাসির সহিত প্রশ্ন করিলেন—"আপনার আছে পরিচয় তাঁর সঙ্গে?"

যুবকের মুখটা বেশ একটু রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, কি একটু

ভাবিল, তাহার পর বলিল—"না।…বলুন আপনার গল্পটা; বাধা দেওয়ার জন্যে মাপ করবেন।"

মিশিরজী নরম হইলেন, বোধ হইল যেন—একটু অপ্রতিভও, বলিলেন—"না, বাধা দেওয়ার কি হয়েছে এতে?…আমি বলছিলাম—রঘুবীর সিংএর তো অভাব নেই দুনিয়ায়, তা জিগ্যেস করেছেন তো আর বাধার কি হয়েছে?…কোথায় বলছিলাম মুকুর্জিবাবু?"

আমি কহিলাম—"বলছিলেন সেই স্বরূপগড়ে বাবু রঘুবীর সিং-এর বাড়ি।"

"হ্যাঁ, ঠিক।…রঘুবীর সিং শিশোধিয়া রাজপুত, সমস্ত চাকলাটাতে খালি শিশোধিয়া রাজপুত, গোয়ালা আর কিছু মুসলমানের বাস। এর মধ্যে শিশোধিয়ারাই বেশি প্রতাপশালী, —একে তো শিশোধিয়াই, তায় জমিজমা বেশির ভাগ তাদেরই, মাথা গুণতিতে কম হলেও তাদেরই দাপটটা সবার ওপরে, সমস্ত চাকলাটার নামও চর-শিশোধী। এখন হয়ত আর ততটা নেই, তবে একসময় বড় ভয়ঙ্কর জায়গা ছিল এই চর-শিশোধী, মুকুর্জিবাবু—মানে, আপনার আমার মতো মানুষের থাকবার স্থান নয়। একে দুটো জেলার সীমানায়, তায় অল্প একটু পশ্চিমে গেলেই অন্য প্রদেশ—ইউ, পি'র গোরখ্‌পুর জেলা এসে পড়ে, উত্তরে বিশ-পঁচিশ মাইলের পরেই নেপাল,—শাসনই যায় একেবারে পালটে—এই সব কারণে লুটতরাজ, চুরি ডাকাতি বড্ড হোত এই জায়গাটায়। এতো গেল বাইরের সঙ্গে

সম্বন্ধের কথা, এদিকে আবার ঘরোয়া লড়াইও লেগেই আছে, জাতে জাতে, আবার প্রত্যেক জাতে আপোষের মধ্যেও। কথাটা বুঝলেন না ?—চর জায়গা যে—এদিকে ঐ ভয়ঙ্করী নারায়ণী, অন্যদিকে তার স্মৃতি—বর্ষা নামলেই যার পূর্ব গৌরবের কথা মনে পড়ে যায় যে সেও একদিন ঐ নদীরই মূল প্রবাহ ছিল—এই দুটো নদী মিলে পাগলের উল্লাসে সমস্ত চাকলাটাকে নিয়ে ভাঙা-গড়ায় ওঠে মেতে—পুরনো জমির নিশানা যায় মিটিয়ে—নতুন জমি জেগে উঠে স্বয়ম্বরা কুমারী মেয়ের মতনই স্বামিত্বে লুব্ধ করে সবাইকে—কার শক্তি আছে আমায় গ্রহণ করো—সমস্ত চরে দাঙ্গাহাঙ্গামা ওঠে জেগে, কত মাথা পড়ে ধড় থেকে গড়িয়ে, বছর ধরে আদালতে চলে তার জের, তারপর আবার আসে বর্ষা—আবার ঘটনা চক্রের ঐ এক আবর্তন—চর-শিশোধীর এই হোল মোটামুটি ইতিহাস। এ-হেন স্থানে বাবু রঘুবীর সিং ছিলেন আবার বিশিষ্ট। প্রথমত ওরকম একটা চেহারাই তো চোখে পড়ে না রাজপুতদের মধ্যেও,—দীর্ঘ সাড়ে ছফুট লম্বা চেহারা, মাথায় সিংহের কেশরের মতন কোঁকড়া কাঁকড়া লম্বা চুল ঘাড়ের ওপর লুটিয়ে রয়েছে, ইয়া মোছ ইয়া গালপাট্টা; সিংহের মতনই সরু মাঝা, তার উপর বুকখানা মনে হয় যেন একজোড়া শাল কাঠের কপাট ভেজানো রয়েছে। গলার আওয়াজটা খনখনে, যখন নিতান্ত সাধারণভাবেও কথা কইতেন, শ্রোতার বুকের ভেতরটা যেন কেঁপে কেঁপে উঠত।

লোকে বলে বয়সকালে বাবু রঘুবীর সিং ডাকাতিও করতেন,

—তাঁর দল তিনদিকের সীমান্ত পেরিয়ে, চম্পারণ, ওদিকে অযোধ্যা প্রদেশ আর উত্তরে নেপালে গিয়ে হানা দিয়ে ধনদৌলত নিয়ে আসত। অতটা জানিনা, আর বিশ্বাস করাও শক্ত, তবে এটা ঠিক যে এক সময় সারা চাকলাটায় ওঁর মতন দোর্দণ্ডপ্রতাপ লোক আর অন্য কেউ ছিল না। জমিদার ওঁর চেয়ে ঢের বড় বড় ছিল আর সব, বরং জোতজমি বলতে ওঁর যা সামান্য ছিল তা থেকে জমিদারদের মধ্যে গণ্যও করা চলত না ওঁকে, কিন্তু বোলবোলাও ছিল ওঁরই সবার ওপরে। অল্প কথাতেই দাঙ্গাহাঙ্গামায় ঝাঁপিয়ে পড়তে চর-শিশোধীর মতো জায়গাতেও ওঁর জোড়া দ্বিতীয়টি ছিল না, আর হারা কাকে বলে তা তো জানতেনই না বাবু রঘুবীর সিং। তেমনি অত্যাচারীও ছিলেন—চরের বাইরে কি করতেন জানিনা, তবে চরের মধ্যে বছর গেলে তিন চারটে মাথা তো খসাতেনই ধড় থেকে—নিজের হাতে, বাকি চেলা-চামুণ্ডারা যা করুক, তাঁর দল ছিল শিশোধিয়া আর গোয়ালা মিলে, মুসলমানদের উনি পরিহার করতেন, বলতেন খাঁটি রাজপুতদের সঙ্গে ওদের কখনও মেলেনি, মিলবেও না।···নিজের নিজের মত আর কি।

ক্রমে রঘুবাবু একটা আতঙ্ক হয়ে উঠলেন চর শিশোধিয়ার, তারপর তিনটে জেলা আর নেপাল মিলিয়ে সারা তল্লাটটার। প্রথম প্রথম বেশ খানিকটা সুনাম ছিল—ডাকাতদের সঙ্গে আমরা সাধারণত যা মিশিয়ে থাকি—গরীবের ওপর অত্যাচার না করা, বড় মানুষদের লুটে গরীবদের সাহায্য করা,—ক্রমে তার

সঙ্গে নানান রকম বদনামও যেতে লাগল মিলিয়ে। এ প্রায় বছর ত্রিশ আগেকার কথা বলছি আপনাকে, আমরা তখন সতের-আঠার বছরের ছোকরা, বুঝতেই পারেন রঘুবীর সিং-এর নামটা আমাদের নও-জোয়ানী কল্পনায় আগুনের শিখা জ্বেলে দিত; তার পরেই সেই গৌরবময় নামের সঙ্গে নিছক অত্যাচারেরই অল্প অপবাদ মিশে আমাদেরও কল্পনার শিখাকে একটু একটু করে ধূমাইত করে আনছে এমন সময় বিহারের ভাগ্যাকাশে সৌভাগ্যসূর্যের উদয় হোল, মহাত্মাজী চম্পারণ সত্যাগ্রহ নিয়ে এখানে পদার্পণ করলেন।"

মিশিরজী একটু থামিলেন, শুধু বিরতির জন্যই নয়, মনে হইল, সেই নবসূর্যোদয়ের পবিত্র স্মৃতি তাঁহার মনটিকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। একটু থামিয়া আবার বলিতে লাগিলেন—"আমার মহাকাব্যে চম্পারণ সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে গোটা দুয়েক সর্গ দোব মনে করছি মুকুজিবাবু, কিন্তু আপাতত তার উল্লেখ এইজন্যে করছি যে বাবু রঘুবীর সিং-এর জীবনে সেটা একেবারে আমূল পরিবর্তন এনে দিলে। কবি বলে গেছেন—চুম্বক মাটিকেও টানে না, কাঠকেও টানে না, টানে শুধু লোহাকে, কেন না লোহাতে আছে বস্তু। তাই হোল,—অমন দুর্দ্ধর্ষ-যে রঘুবাবু, নিতান্ত অসহায়ভাবে আর নিতান্তই নিবিড়ভাবে মহাত্মাজীর কাছে পড়লেন টানা। চর-শিশোধীর নাট্যমঞ্চ যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেল, তার জায়গায় শোনা যেতে লাগল মহাত্মাজীর পাশে চম্পারণ সত্যাগ্রহে বাবু রঘুবীরের কীর্তিকলাপের কাহিনী—

তন্-মন্-ধ্যান্ দিয়ে তিনি নিরুপদ্রব সত্যাগ্রহে গেছেন মেতে, নিতান্ত তপশ্চারীর মতনই ; মহাত্মাজীর একেবারে দক্ষিণ হস্ত — বিহার থেকে নীলকুঠিরূপ কলঙ্ক একেবারে মুছে ফেলবার জন্যে নিজের সমস্ত সম্পত্তি মহাত্মাজীর হাতে তুলে দিয়েছেন, জীবন পর্যন্ত করেছেন পণ।

বাবু রঘুবীর সিংকে আমি জীবনে দুবার দেখি ; একবার কি একটা ফৌজদারি মোকদ্দমা ছিল, আমার বাড়ির সামনে দিয়েই একটি দলের সঙ্গে তিনি যান, কি জানি কেন, পদব্রজেই। আমার কথাটা বোধ হয় পক্ষপাতদুষ্ট বলে মনে হবে, কিন্তু ছাপরা পৌরুষের পীঠস্থান মুকুর্জিবাবু, এখানকার পথে ঘাটে পুরুষের মতন পুরুষ দেখা এমন কিছু অসাধারণ ব্যাপার নয়, কিন্তু তবুও তার মধ্যেও বাবু রঘুবীর সিং-এর সেদিনের সেই মূর্তিটি আমার এখনও যেন চোখে লেগে আছে—একটি কম্প্র আগুনের শিখা যেন পথ বেয়ে চলেছে—দেখবার জন্যে রাস্তার দুধারে লোক দাঁড়িয়ে গেছল, বাড়িতে বাড়িতে জানালা কপাট গেছল খুলে।··· তারপর দ্বিতীয়বার দেখলাম চম্পারণ সত্যাগ্রহ শেষ হলে তিনি যখন ফিরে আসেন ; ক্ষাত্রশক্তির সঙ্গে ব্রহ্মণ্য তপের অমন অপূর্ব সমন্বয় আমি জীবনে আর দেখি নি। আগাগোড়া মোটা খদ্দর-পরা, তাতেও প্রয়োজনের এতটুকু বেশি নেই কোথাও, শরীর অনেক ক্ষীণ, তবুও কেমন করে যেন মনে হয় সে বলের সমস্তটাই আছে, শুধু আধারের বাহুল্যই গেছে কমে। কি তুলনা দিই ?— প্রথম দিন যদি তাঁকে আগুনের শিখা বলে মনে হয়েছিল,

সেদিন মনে হোল এ যেন একটা তপ্ত ইস্পাতের ছড়; সেই আগুনই, তবে আলগা নয়, জমাট; শিথিল নয়, সংহত।

ছাপরায় সমস্ত জেলার তরফ থেকে তাঁকে একটা অভিনন্দন দেওয়ার জন্যে টেনে আনা হয়েছিল।—টেনে আনা হয়েছিল বললাম কেননা অহিংসার সঙ্গে মহাত্মাজী তাঁর অণুতে অণুতে আর একটা জিনিস যা সাঁদ করিয়ে দিয়েছিলেন তা নিস্পৃহতা। আমি গিয়েছিলাম সেই সম্মেলনে, মনে হচ্ছিল যশের তিলক পরাবার জন্যে এই যে বিরাট জনসমাবেশ এ তাঁকে পীড়িত করছে, পরিত্রাণ পেলেই যেন বাঁচেন—তাঁর যেন কত অপকার করছে—যশের ভার চাপিয়ে তাঁর ব্রত থেকে যেন তাঁকে নামিয়ে আনছে ধীরে ধীরে। আমি সেদিন বসে বসে শুধু সেই প্রথম দেখা রঘুবীরের সঙ্গে সে-দিনের রঘুবাবুকে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখছিলাম আর মনে মনে কল্পমূর্তি গড়বার চেষ্টা করছিলাম সেই পুরুষের যাঁর মন্ত্র সেই শক্তিমত্ত রত্নাকরকে এই তপঃসিদ্ধ বাল্মীকিতে পরিণত করতে পারে।

এর পরেই রঘুবাবু স্বরূপগড়ে গিয়ে বসলেন, তারপর এই ত্রিশ বৎসর ধরে নিঃস্বার্থ, নির্লোভ, হিংসালেশহীন মন দিয়ে একটু একটু করে অশান্ত, আত্মবিচ্ছিন্ন চর-শিশোধীর রূপ দিলেন একেবারে বদলে, তাকে করে তুললেন সত্যাগ্রহীর মহাতীর্থ। এর মধ্যে শুধু একটা চঞ্চলতা জেগে উঠেছিল—বিয়াল্লিশের জন-বিক্ষোভ, কিন্তু তাতেও চর-শিশোধীর বিশেষত্ব ছিল, সে প্রাণ দিয়েছিল, নেয়নি একটিও প্রাণ।

এরপর এল ভারতের অধুনাকালের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য। যে-মুসলমানের সঙ্গে এক হয়ে নেতাজী ইংরাজের আসনের গোড়া কাঁপিয়ে দিলেন, সেই মুসলমানকে হাত করে সে তার শেষ পরীক্ষা আরম্ভ করে দিলে—এল ছেচল্লিশের পনেরই আগষ্ট। কলকাতা বম্বাই গেল তছনছ হয়ে, তারপর একটা সাময়িক বিরতির পর এল নোয়াখালি, তার গায়ে-গায়েই বিহার। কলকাতার হত্যাকাণ্ডেও বিহারের হিন্দু মাথা ঠিক রেখেছিল, কেননা সেটা মোটামুটি গভর্ণমেণ্ট বনাম হিন্দু অধিবাসী হলেও হিন্দুরা সংখ্যায় কম ছিল না আর সেইজন্যে দ্বিতীয় দিন থেকেই কড়া জবাব দিতে আরম্ভ করেছিল; কিন্তু নোয়াখালির নিতান্ত সংখ্যালঘুর ওপর অমানুষিক অত্যাচারে—য়ার মধ্যে ধর্ম আর স্ত্রীলোক ছিল প্রধান লক্ষ্য—বিহার আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলে না। আমি এই সহরে বসে সে-বিক্ষোভ দেখেছি মুকুর্জিবাবু, যা শুনেছি তার কথা বাদই দিই। কয়েকদিনের জন্য মানুষ যেন আর মানুষ রইল না; হত্যা, ধ্বংস, লুট—কোনটে দিয়ে যে প্রতিশোধের বাসনাটা মেটাবে যেন ভেবে ঠিক করতে পারে না। হিন্দু যে এক কথাতেই এত উগ্র হ'য়ে উঠতে পারে আমি কল্পনাও করতে পারতাম না, মুকুর্জিবাবু; সেই শান্ত নিরীহ জাত, যুগ যুগ ধরে নীরবে সহ্য করতেই যারা অভ্যস্ত, একদিনেই গেল একেবারে বদলে; এ যেন ঠিক একটা মলয় পবনের প্রবাহ নিমিষেই কালবৈশাখীতে রূপান্তরিত হয়ে গেল। কোথায় আরম্ভ হল প্রথমে বলা কঠিন, একবার আরম্ভ হবার পর সহরের ধাক্কা

লাগল গ্রামে, গ্রামের ধাক্কা লাগল সহরে, এক জেলার প্রতিধ্বনি উঠল অন্য জেলায়, সারা বিহার যেন ধ্বংসের হিংসা-মাতুনিতে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। এই বিহারেই ভগবান বুদ্ধ তাঁর সম্বোধি লাভ করেছিলেন নাকি ?—তার পর আড়াই হাজার বছর পরে এই নিতান্ত সেদিন নবকলেবর নিয়ে অহিংস সংগ্রামে যে হিংসার অবসান ঘটিয়ে গেলেন সে না এইখানে এই বিহারেই ?

ক্রমে চর-শিশোধীতে এর সাড়া পৌঁছুল।

আগেই বলেছি চর-শিশোধীতে কিছু মুসলমানেরও বাস আছে। তারা সাধারণভাবে হিন্দুদের সঙ্গে মিশ্রিতই হয়ে আছে—এ গ্রামে দশ ঘর, ওগ্রামে পনের ঘর এই রকম ; এ ভিন্ন সমস্ত চাকলাটায় একেবারে নিছক মুসলমান নিয়ে একটা গ্রাম আছে, নাম হাসানপুর। জায়গাটা স্বরূপগড় থেকে মাইল পাঁচেক দূরে মূল নারায়ণীর একেবারে তীর ঘেঁসে ; বড় গ্রাম, প্রায় দেড় শত ঘরের বসতি, সমৃদ্ধও। নিজ্ স্বরূপগড়ে দশবারো ঘর মুসলমানের বাস।

অল্প অল্প গুঞ্জন উঠল চর-শিশোধীতে। রঘুবাবুর কাছে চরের মুসলমানেরা পৌঁছুল, সমস্ত গ্রাম থেকেই দু'এক জন করে একত্র হয়ে। রঘুবাবু তাঁর খদ্দরের বস্ত্রটা দেখিয়ে তাদের আশ্বাস দিলেন। ওরা চলে গেলে একদিন পরে এল হিন্দুরা, চরের কাজে যারা অগ্রণী—লীডার বলতে পারা যায়—জনতা চঞ্চল হয়ে উঠেছে, তারা বলছে এই সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে—মুসলমানদের মতে সেটা জাতীয় সংঘর্ষই—চর-শিশোধার এই

নিষ্ক্রিয়তা কাপুরুষতাতেই দাঁড়াচ্ছে, চারি দিকে তার বদনাম যাচ্ছে র'টে।

জনতার নামে কথাগুলা বললেও রঘুবাবু বুঝলেন যারা বলতে এসেছে এগুলো তাদের অন্তরের কথা। তাঁর এতদিনের ব্রত এই বৃদ্ধ বয়সে নষ্ট হতে চলল নাকি? মনে মনে ক্ষুণ্ণই হলেন, কিন্তু বাইরে সে ভাবটা না দেখিয়ে শান্ত কণ্ঠে বললেন—"একটা কথার উত্তর দিন আপনারা—সংযম কি কাপুরুষতা? অন্তত আপানারা কি এই শিক্ষাই এতদিন ধরে পেয়েছেন?"

সবাই চুপ করে মাথা নিচু করে রইল, শেষে একজন মাথা তুলে প্রতিপ্রশ্ন করলে—"কাপুরুষতাকে কি অনেক সময় সংযমের পোষাক পরিয়ে গৌরবান্বিত করা হয় না?"—নও-জোয়ান, খদ্দরপরিহিতই কিন্তু চোখের দৃষ্টি আর সবাইয়ের চেয়ে একটু অন্য রকম; বেশ সোজা মুখ তুলে অকুণ্ঠস্বরে উত্তরটা দিলে।

বাবু রঘুবীর সিংএর জীবনে বোধ হয় এই প্রথম এ ধরণের প্রতিপ্রশ্ন, চোখ তুলে ছেলেটির দিকে চাইলেন। তাঁর অত বিশিষ্ট চেহারার মধ্যে আবার সবচেয়ে বিশিষ্ট ছিল তাঁর চোখদু'টি, বিশাল আর রক্তপ্রান্ত; রক্তরেখাগুলা যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল হঠাৎ। কিন্তু সে ক্ষণেকের জন্যে, তখুনি দৃষ্টি শান্ত করে সে ছেলেটিকে বললেন—"তুমি এখানে এসো।"

ছেলেটি এলে ডান হাতটা তার পিঠে দিয়ে বললেন—"আমার পাশে বোস তুমি।"

একটা থমথমে ভাব রইল ছেয়ে। একটু পরে বাবু রঘুবীর সিং পিঠে হাত দিয়েই তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন—“আমার বয়স আশির কাছাকাছি হয়ে এল ; এবার তো চর-শিশোধীর ইজ্জৎ তোমাদের হাতেই তুলে দিয়ে যেতে হবে। অন্যায় দিয়েই তার নূতন ইজ্জৎ গড়বে তোমরা ?”

—ছেলেমানুষ, এ-ধরণের ব্যবহারে আর এতবড় সম্মানে যুবকের গলাটা একটু ধরে এসেছিল হঠাৎ, তবু কিন্তু পরিষ্কার করে নিয়ে বললে—‘আমায় ক্ষমা করবেন, কিন্তু অন্যায় কি আমরা আরম্ভ করেছি ?’

‘এখানে তো আরম্ভ করতে যাচ্ছ।’

‘জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ যখন, একে অন্যায় বলা যায় না।’

‘জাতিতে জাতিতে—এতো ইংরেজের কথা, আর ইংরেজের হাতের খেলনা হয়ে যারা সর্বনাশ করছে দেশের, সেই সব মুসলমানের কথা। তুমি যাঁর চিন্তা আর অভিমতের প্রতীক ঐ খদ্দর পরছ তিনি বলেন—ভাইয়ে ভাইয়ে। কার কথা বিশ্বাস করবে বলো ?’

যুবক নিরুত্তর রইল। উত্তর দিলে অন্য একজন, বয়স্থ এবং কতকটা নরমপন্থীই, বললে—‘মুস্কিল হচ্ছে কলকাতা থেকে রোজই কিছু কিছু লোক পালিয়ে আসছে—হিন্দু মুসলমান দুই-ই। আতঙ্কে পালিয়ে আসা এক কথা, কিন্তু গুজব মুসলমানদের অনেকেই লুটের মাল নিয়ে আসছে, কেননা গবর্ণমেণ্টের সহায়তা থাকায় প্রথম ঝোঁকে এবং পরেও লুট

করেছে ওরাই। তার ওপর এমনি আক্রোশ তো আছেই, বিনা দোষে মার খেলে, ক্ষতিগ্রস্ত হলে যেটা স্বাভাবিক। এই চাকলার মধ্যেই অনেকের বাপ গেছে, ছেলে গেছে, ভাই গেছে।'

রঘুবাবুও এবার একটু চুপ করে রইলেন, তারপরে বললেন—'যেটা স্বাভাবিক সেটা যে সব সময় ন্যায়সঙ্গত হবেই এমন নয়, আমার বক্তব্য এই—রামের দোষে শ্যামকে মেরে সমস্ত ভারতবর্ষটাকে কলকাতা-নোয়াখালি করে তুলে কি হবে?... তবে একটা কথা আমি নতুন শুনছি, এই লুটের মাল নিয়ে এসে চর-শিশোধী ভর্তি করা। আমি অথর্ব হয়ে এসেছি, সব জিনিসের সে-রকম খোঁজ রাখতে পারি না, সব কথা কানেও আসে না আমার। চর-শিশোধীকে আমি এ-ভাবে অপবিত্র হোতে দোব না এই কথা আপনাদের দিচ্ছি—যারা এ-অপরাধে অপরাধী তারা সাজাও পাবে। এক কাজ করুন—যে মুসলমানেরা আমার কাছে কাল এসেছিলেন তাঁদের কাল বিকেলে আবার একবার আসতে বলুন, প্রতিগ্রামে মুসলমান পাড়ায় একজন দুজন করে লোক পাঠিয়ে দিন তাহলেই হবে; আর আপনারাও আসুন। আমি সব ঠিক করে দোব, আর গোলমাল থাকবে না।'

তারপর যুবকটির পিঠে আবার হাত দিয়ে জিগ্যেস করলেন —'তোমার নামটি কি বাপু?'

ছেলেটি বললে—'জগৎকিশোর যাদব।'

একটু হেসে প্রশ্ন করলেন—'কি ঠিক করলে?'

যুবক নত হয়ে পায়ে মাথা ঠেকালে, তারপর মুখ তুলে, সেইরকম স্পষ্ট দৃষ্টিতে চেয়ে বললে—'আপনার চর-শিশোধীতে আমি অন্যায় হতে দোব না কখনও, প্রতিজ্ঞা করছি।'

রঘুবাবু তার মাথায় হাত দিয়ে বললেন—'আমার আশীর্বাদ রইল তোমার সঙ্গে।'

যুবক বললে—'ক্ষমাও আমার কম দরকার নয়; আমি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে ফেলেছি। আমার প্রায়শ্চিত্ত কি বলুন?'

রঘুবাবু সস্নেহ কণ্ঠে বললেন—'আমারও তাই মনে হয়েছিল আগে, আমার ত্রিশ বছর আগেকার দুষমন রাগকে তুমি টেনে বের করেছিলে একটু হলে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আমার ভুল ভেঙ্গে গেছল, ওটা ঔদ্ধত্য তো নয় তোমার, তুমিই আসল সত্যাগ্রহী, ভয়ে বা সঙ্কোচে অন্তরের সত্য বিশ্বাসটা চেপে রাখোনি। তোমার প্রতিজ্ঞাও কখনও ফাঁকা কথামাত্র হয়েই থাকবে না। তোমার প্রায়শ্চিত্তের কথা আসে না, আসে পুরস্কারের কথা—আমি তোমায় একটা বড় কাজের ভার দিলাম। চর-শিশোধীতে পনেরটা গ্রাম আছে, আমার ঘোড়াটা নাও, যে মুসলমান ভাইয়েরা কাল এসেছিলেন আমার কাছে, ঘুরে ঘুরে তাঁদেরই সবাইকে আবার বলে এসো, গ্রামে গেলেই টের পেয়ে যাবে কারা এসেছিলেন।'

পরের দিন যথাসময়ে চরের হিন্দু-মুসলমান প্রতিনিধিরা এসে রঘুবাবুর দেউড়িতে জমা হোল। তিনি বিধান দিলেন প্রত্যেক গ্রামে দুজন করে হিন্দু আর দুজন করে মুসলমান

নিয়ে একটা অনুসন্ধান পার্টি হবে এবং তাঁরা নির্ণয় করবেন কার ঘরে কি লুটের মাল এসেছে—হিন্দুই হোক বা মুসলমানই হোক। সেই জিনিসগুলি আপাতত চর-শিশোধীর কংগ্রেসভবনে জমা হবে, আলাদা আলাদা করে সে-সবের একটা পুরো ফিরিস্তি রাখা হবে। যারা লুটের অপরাধে অপরাধী তাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা হোল চর-শিশোধী তাদের চিরতরেই ছেড়ে যেতে হবে—তা সে বাড়ির কর্তাই হোক, বাড়ির ছেলেই হোক বা কোন আত্মীয়-স্বজনই হোক।"

মিশিরজী একটু চুপ করিলেন। আমি বলিলাম—"সাজাটা একটু বেশি হয়ে গেল না ? সবার তো সমান দোষও ছিল না।"

মিশিরজী উত্তর করিলেন—"সেই কথা ওরাও বললে কাকুতি-মিনতি করে, এমন কি কয়েকজন হিন্দুও যোগ দিলে, রঘ্‌ঘুবাবুর দেউড়িতে এলে সবারই কেমন একটা উদারতা এসেই যেত। কিন্তু তিনি অনেক ব্যাপারেই নরম হলেও এই জিদটা একেবারেই কড়া হয়ে ধরে রইলেন। অনেকে ভেতরে ভেতরে ক্ষুণ্ণ হয়েছিল এর জন্যে ; আমারও মনটা এই কথাটা শুনে প্রথম প্রথম একটু ধোঁকায় পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু তারপর এরই সূত্র ধরে একদিন আমার একটা মস্ত বড় সমস্যা মিটে গেল মুকুর্জিবাবু।"

আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মুখ তুলিয়া চহিলাম, মিশিরজী বলিলেন—"বড় আশ্চর্যের কথা নয় কি ?—যিনি একেবারে সত্য আর ন্যায়ের মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন শেষ জীবনে, এই

অপরাধটা এত বড় করে দেখলেন কেন? দাঙ্গায় লুটতরাজ করে এনে ঘর ভর্তি করেছে—এর বেশি কিছু নয়ত? তারপর একদিন বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো একটা কথা মনে উঠে সবটা যেন পরিষ্কার হয়ে ওঁর চরিত্রটাকেও আমার চোখে যেন আরও নির্মল করে দিলে; যৌবনে যখন ওঁর ডাকাতি করার অপবাদ ছিল তখন শেষ দিকে তার সঙ্গে এটাও জুড়ে গিয়েছিল যে লুণ্ঠিত টাকাকড়ি গয়নাপত্র উনি নিজের ঘরে জমা করতে আরম্ভ করেছেন—যা নাকি করতেন না আগে—বড়দের, অত্যাচারীদের লুট করে গরীবদেরই পোষণ করতেন। আমি মনে মনে রঘুবাবুর চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে চরিত্রের যে কল্পচিত্রটি এঁকেছিলাম, এই মসীরেখাটুকু তাকে যে বিকৃত করেছিল, আমি যে মনে মনে কষ্ট পাচ্ছিলাম এটা অস্বীকার করব না আমি। ওঁর এই জিদ দেখে আমার আর সন্দেহ রইল না যে ও-অপবাদটা সর্বৈব মিথ্যা। এই যে হীনবৃত্তি, এই যে আত্মম্ভরী লালসা, এটাকে উনি নিজের জীবনে প্রশ্রয় দেন নি কখনও বলেই এদের মধ্যেও তা ক্ষমা করতে পারলেন না কোন মতে। উনি দাঙ্গাটাকে কতকটা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখতে পেরেছেন—নিজের নিজের স্বার্থের জন্যে কতকগুলো লোক মানুষকে ধর্মের নামে নাচিয়ে পাগল করে তুলেছে; কিছু মাথা না গিয়েই পারেনা সামলাতে সামলাতেও; কিন্তু শেয়ালের মতন এই হেয় সঞ্চয়-বৃত্তি কেন? এই সঙ্গে আরও একটা কথা, ছিল,—চর-শিশোধীর সম্বন্ধে তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা,—তিনি এ

পবিত্র ভূমিকে কলুষিত হতে দেবেন না, শৃগাল বৃত্তিকেরা বাইরে গিয়ে তাদের পাশবিকতা চরিতার্থ করুক।

কিন্তু এর ফল হোল অন্য রকম। সেকথা পরে বলছি। আপাতত কয়েকদিন সব ঠাণ্ডা রইল। লুটের মাল যথানির্দেশ কংগ্রেস আফিসে জমা হোতে লাগল। মুসলমানদের মধ্যে একটু অসন্তোষের গুঞ্জন উঠল বটে, বিশেষ ক'রে হাসানপুরের মতন জায়গায়, কিন্তু তারা কিছু বলতে সাহস করলে না। হয়তো লুটের অপরাধীদের মধ্যে যারা তেমন নজরে পড়ে নি সবার, তাদের কিছু কিছু রইল লুকিয়ে, কিন্তু অধিকাংশকেই যেতে হলো —অন্তত কিছুদিনের জন্যে; বৃহত্তর বিপদ থেকে বাঁচবার জন্যে গ্রামের মুখিয়ারা ঠেলেঠুলে পাঠিয়ে দিলে, তা ভিন্ন বাবু রঘুবীর-সিংএর সংস্পর্শে এসে বয়স্থ মুসলমানদের মধ্যেও এমন অনেকে ছিল যারা এই সমস্ত ব্যাপারটাকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে না দেখে পারছিল না। বেশ ঠাণ্ডা হোল চর-শিশোধী।

কিন্তু এই অতি-কঠোরতার কুফলটা ফলল অন্যদিক দিয়ে। আস্তে আস্তে একটা ধারণা হিন্দুদের মধ্যে গড়ে উঠতে লাগল যে, বাবু রঘুবীর সিং মুসলমানদের ওপর বিরূপ হয়েছেন; স্পষ্ট বলছেন না, তবে এই যে একরকম লঘু পাপে গুরু দণ্ড এটা তারই অতি স্পষ্ট সঙ্কেত। লোকের মাথা তখন গরম, নদী পেরিয়েই চারিদিকে লুট, হত্যা, অগ্নিকাণ্ড চলছে, বিহারের চারিদিক থেকে নিত্যই এসে পড়ছে গরম গরম খবর, ওরা আর ওঁর চরিত্রের মূলমন্ত্রটার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে না যে এই প্রবঞ্চনা,

এই পেটে-এক মুখে-এক ওঁর পক্ষে কতটা অসম্ভব। ভেতরে ভেতরে চঞ্চল হয়ে উঠছে, নোয়াখালির নিত্যনতুন খবর আসছে—উগ্র, সত্যমিথ্যায় মাখামাখি। ওরা নিশ্চেষ্টতার অসহিষ্ণুতায় মনে মনে ছুতো খুঁজছিলই, এইটুকুকেই নিজের মনের রঙে রাঙিয়ে প্রতিশোধের জন্যে তোয়ের হয়ে উঠতে লাগল ভেতরে ভেতরে।

তিন দিন পরের কথা। সব ঠিক যাচ্ছে, লুটের মাল আজও কিছু পৌঁছে দিয়েছে, আরও কয়েকজন বহিষ্কৃত হয়েছে সে খবরও পেয়েছেন আজ, চর-শিশোধী ঠাণ্ডা। একমাত্র নতুন খবর, দুটো নদীতেই বন্যার জল আরও ঠেলে উঠেছে···ভালো, বাইরের এই হত্যালিপ্ত জগৎ থেকে চর-শিশোধীকে যতটা বিচ্ছিন্ন করে দেন মা নারায়ণী···রাত বারোটার সময় নিশ্চিন্ত এবং কতকটা প্রসন্ন মনেই তাঁর গীতা-পাঠ, চরখা-কাটা শেষ করে শোবার ঘরে প্রবেশ করেছেন রঘুবাবু, এমন সময় চাকর এসে খবর দিলে ছোকরা একটি ডাকছে, বললে বিশেষ জরুরি কাজ।'

বাইরে এসে দেখেন জগৎকিশোর। উত্তেজনায় মুখটা রাঙা, চুলগুলো উস্কখুস্ক, বেশ টের পাওয়া যায় দৌড়েই এসেছে; ঘেমেছে, সংযত হবার চেষ্টা করেও একটু একটু হাঁপাচ্ছে।

রঘুবাবু প্রশ্ন করলেন—'কি?—এত রাত্রে তুমি যে—এভাবে?'

'গোকুলচরের মুসলমানদের ওপর হামলা হবে।'

'কারা করবে ?'

'নরসিংপুরের গয়লারা, সুঁতির ওপার থেকে এসে।'

বয়সে রঘুবাবুর কণ্ঠ শিথিল হয়ে এসেছে, তবু হঠাৎ উত্তেজনায় খন্‌-খন্‌ করে উঠল—'নরসিংপুরের কি অধিকার আমার এলাকায় পা দেবার ?'

তখুনি হুঁস হোল জগৎকিশোরের কাছে এর উত্তর নেই। সংযত করে নিলেন নিজেকে, কিন্তু তখনও ঠোঁট দুটো থর থর করে কাঁপছে, প্রশ্ন করলেন—'কখন ?'

'সেটা ঠিক জানি না, তবে সকাল পর্যন্ত নিশ্চয়। আর একটা কথা, নামটা নরসিংপুরের কিন্তু এপারেরই দূরের দূরের কয়েক গ্রামের লোকে করবে কাজটা; কিছু নৌকা থাকবে ওপারের, তার সঙ্গে এপারের নৌকো সব যোগ দেবে।'

'কেন ?'

প্রশ্নটা করেই উত্তরটা রঘুবাবু নিজেই পেয়ে গেলেন, দাঁতে দাঁত পিষে বললেন—'ও! আমায় খাতির! রঘুবাবুর ভয়! এ প্রহসনের দরকার ?...কে আছে এখানে ?'

চাকর এসে দাঁড়ালে বললেন—'আমার ঘোড়ায় জিন্‌ কষতে বল্‌।'

জগৎকিশোরকে বললেন—'তুমি স্বরূপগড়ে তাড়াতাড়ি জানিয়ে দাও চারিদিকে যে আমি গোকুলচরে যাচ্ছি, তারপর সবাইকে সঙ্গে করে নিয়ে তুমি যত শীগগির পার চলে এসো।'

গোকুলচর প্রায় তিন ক্রোশ দূরে, ঠিক সুঁতির ওপর।

গ্রামটা হিন্দু-মুসলমানের মিশ্রিত গ্রাম, প্রায় আধাআধি, সবশুদ্ধ সত্তরআশি ঘর লোক হবে। রঘুবাবু যখন ঘোড়ায় করে গিয়ে পৌঁছলেন তখন রাত প্রায় দেড়টা হবে। মুসলমান পাড়াতেই গিয়ে উঠলেন, সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে, পাড়ার মাঝামাঝি একটা খোলা জায়গায় একটা পাকুড়গাছের নিচে অনেকে জমা হয়েছে, লাঠি, ফরসি বর্ষাও আছে অনেকের হাতে। রঘুবাবুকে দেখে সবাই ঘেরে ঘুরে হৈ হৈ করে দাঁড়াল। জিগ্যেস করলেন—“এখানকার হিন্দুরা নেই তোমাদের মধ্যে ?”

বয়স্থ গোছের কয়েকজন এগিয়ে এল, জড়াজড়ি করে উত্তর দিলে—‘তারা বললে ওপার থেকে ওরা এসে পড়লে তারা এসে বাধা দেবে···কয়েকজন বললে হুজুর···সবাই নয়···’

‘বাকি সবাই তাদের সঙ্গে যোগ দেবে ?’

‘যোগ হয়তো দেবেনা···কিছু কিছু হয়তো পারেও দিতে··· তবে আমাদের সাহায্য কেউ করতে আসবে বলে আমাদের বিশ্বাস নেই হুজুর···’

‘গ্রামে প্রত্যেক হিন্দুর ঘরে গিয়ে বলো রঘুবাবু এসেছেন, প্রত্যেক ঘরের সমর্থ লোককে আসতে বলছেন যা অস্ত্র-আছে হাতে নিয়ে।···দাঁড়াও, এমনি হয়তো বিশ্বাস করবে না, কে ঘোড়া চড়তে পার তোমাদের মধ্যে ?’

অনেকেই পারে বলে এগিয়ে এল। একজনকে বেছে নিয়ে রঘুবাবু বললেন—‘আমার ঘোড়াটা নিয়ে যাও, অবিশ্বাসের ছুতো করতে পারবে না কেউ।’

কথা স্বভাবতই কম কইতেন, লোকটা চলে গেলে একেবারে চুপ করে একদিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

হিন্দুরা জমা হতে লাগল দু'দশ জন করে, আধঘণ্টা তিন কোয়ার্টারের মধ্যে প্রায় শ'তিনেক হিন্দু হোল জমা। রঘুবাবু মুসলমানদের বললেন, 'তোমরা সবাই বাড়ি যাও, ইচ্ছে হয় জেগে থাকতে পার, তবে কোন ভাবনা নেই, হিন্দুর অন্যায়ের জন্যে হিন্দুরাই প্রাণ দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করবে।'

জগৎকিশোর এসে পৌঁছুল, একটা সাইকেল জোগাড় করেছে। বললে, স্বরূপগড়ের হিন্দুরা আসছে, পথেও যে গ্রাম পড়েছে, বলতে বলতে এসেছে জগৎকিশোর। কাছে-পিঠের গ্রাম থেকে জুটতেও লাগল হিন্দুরা, সবাই হাতিয়ার-বন্দ্। দলবল নিয়ে রঘুবাবু নদীর তীরে এসে দাঁড়ালেন। কতক কতক লোককে গ্রামটার অন্যদিকে গিয়ে পাহারা দিতে বললেন, জমির দিক থেকে আক্রমণের ব্যবস্থা না ক'রে নৌকো থেকে নামা যে দুষ্কর এটা আর কেউ না বুঝুক তাঁর বুঝতে দেরি হোল না।

ভরা জ্যোৎস্না রাত্রি, বন্যার গৈরিক জলে সুঁতিটা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়েছে, একূল থেকে ওকূল দেখা যায় না। লোকে বলাবলি করে, নদী বোধ হয় এবার পুরনো খাতেই নামবে। যতদূর দৃষ্টি যায় একটিও নৌকোর চিহ্নমাত্র নেই। আস্তে আস্তে ঊষার আলো ফুটল, দৃষ্টি আর একটু প্রসারিত হোল; কোথায় নৌকো? আরও একটু আলো স্পষ্ট হওয়ার পর দেখা গেল বহুদূরে কতকগুলো নৌকো প্রাণপণে দাঁড় ঠেলে যেন উত্তর দিকে চলেছে।

গ্রামের মধ্যে চর ছিল ওদের। সুঁতির ওপরেই আগে থাকতে খবর পৌঁছে গেছল স্বয়ং রঘুবাবু মুসলমানদের আগলে দাঁড়িয়েছেন,—নামা তো দূরের কথা, কেউ চেহারা দেখাতেও সাহস করলে না।

মনে হোল চর-শিশোধী নিরুপদ্রব হোল, কিন্তু এই সময় বিহারের হাওয়াটা বড় এলোমেলো হয়ে উঠল। মহাত্মাজী বললেন বিহার ঠাণ্ডা না হ'লে তিনি আমরণ উপবাস করবেন। দিল্লী থেকে বড়লাট এসে পড়লেন, নেহেরুজী এলেন, বললেন—হিন্দু ঠাণ্ডা না হলে ওপর থেকে বম্ বর্ষাবার ব্যবস্থা করবেন। হিন্দুদের ওপর চলল গুলি। মহাত্মাজীর প্রাণের ভয়েই হোক বা নিজেদের প্রাণের ভয়েই হোক, হাঙ্গামাটা যেমন হঠাৎ উগ্র হয়ে উঠেছিল, তেমনি হঠাৎ নরম হয়ে এল।

মুসলমানদের মধ্যে কিন্তু এর প্রভাব অন্যরকম হোল। অবস্থাটা বেশ স্থিরভাবে না বুঝে তারা উলটে মাথা ঝাড়া দিয়ে ওঠবার চেষ্টা করলে—বিশেষ করে যেখানে সংখ্যায় বেশি। পরে শুনেছি ঠিক এই সময়ে ছোট-বড় কয়েকটা দাঙ্গা তাদেরই শুরু করা। দূরের কথা ভালো রকম জানি না, কিন্তু চর-শিশোধীতে কতকটা সেই ধরণের ব্যাপার হোল।

আগেই বলেছি হাসানপুরে বরাবরই একটু অন্যরকম ভাব ছিল, সব লুটের অপরাধীকে সেখান থেকে তাড়ানো হয়নি বা তাড়াতে পারা যায় নি, লুটের মালও থেকে গিয়েছিল অল্পবিস্তর। এই সময় আবার সাহায্য দেবার ছুতোয় অনেক পাঞ্জাবী মুসলমান

বিহারে ছড়িয়ে পড়ল এবং চর-শিশোধাতে সাহায্যের কোন প্রশ্নই না থাকলেও তাদের অনেকগুলো পড়ল ঢুকে। তারা ঘুরে ঘুরে মুসলমানদের মনে বিষ ঢেলে বেড়াতে লাগল। বিশেষ করে হাসানপুরের গুঞ্জন গেল বেড়ে, সেখানে পাঁচ-সাত ঘর হিন্দু ছিল, তারা মেয়েছেলেদের দিলে সরিয়ে।

গোকুলচরের মুসলমানেরাও নাকি একটু চঞ্চল হয়ে পড়েছে শোনা গেল ; হাসানপুরের মুসলমানেরা নাকি তাদের 'অওরাৎ' বলে ঠাট্টা করছে, তারা হিন্দুর পাহারার জোরে, তার দয়ায় বেঁচে আছে।

এই সময় বাবু রঘুবীর সিং-এর শরীরটা বেশ অসুস্থ যাচ্ছিল। বয়স হয়েছে অতিরিক্ত, সেদিন গোকুলচরে রীতিমতো অত্যাচারও গিয়েছিল দেহমনের ওপর দিয়ে। তবুও সবাইকে ডেকেডুকে তিনি ঠাণ্ডা করে রাখলেন। এই ডাকার মধ্যেও একটি ব্যাপার হোতে লাগল ক্রমেই বেশি করে—মুসলমানরা কম আসতে লাগল, কোন কোন স্থলে ছুতানাতা করা সত্ত্বেও মনে হোল ইচ্ছে করেই, কোন কোন স্থলে যারা আসতে চায় তাদের রুখে রাখলে। তবে এলও অনেকে, সম্প্রদায়ের দিক থেকে ক্ষমা ভিক্ষা করলে। এসব ছোট কথা যে তিনি বড় করে দেখবার লোক নয়, আহত হয়ে তাদের মনের ভাবটা যে কতকটা এরকম হওয়াও স্বাভাবিক— এইসব বলে তাদের সান্ত্বনা দিলেন রঘুবাবু। হিন্দুরাও এদিকে বিচলিত হয়ে উঠেছে। জগৎকিশোর একদিন একা পেয়ে হাত কচলে বললে—'অন্যায় বড় বেড়ে যাচ্ছে যে—লুটের মাল আবার

অবাধে আসতে আরম্ভ হয়েছে, সেই সব লোকেরাও অনেকে আসছে ফিরে।'

রঘুবাবু তার পিঠে হাত দিয়ে সস্নেহে বললেন—'মনে করো আমি নেই জগৎকিশোর—দেখছ তো, না থাকার মধ্যেই—তোমার হাতে চর-শিশোধী রয়েছে মনে করে মাথা ঠাণ্ডা রেখে যাও। যতই করুক, ওরা উলট হাঙ্গামা বাধাতে কোন মতেই সাহস করবে না। এদিকে গবর্ণমেণ্টও খুব সতর্ক হয়ে উঠেছে, এই রকম লোক আর এই রকম চোরাইমালের ব্যবস্থা এবার তারাই করবে, আমাদের ভাবতেও হবে না।'

হঠাৎ জগৎকিশোরের হাত দুটো ধ'রে মিনতির স্বরে বললেন—'জগৎ, মনে হচ্ছে আমার দিন হয়ে এসেছে, যাবার সময় আমার সোনার চর-শিশোধীকে রক্তরঙীন দেখে যেতে হবে তোমরা থাকতে?'

চোখ দু'টো ছলছল করে এল,—যে-চোখে কেউ কখনও অশ্রু বলে জিনিস দেখে নি।"

মিশিরজী একটু চুপ করিলেন, তাহার পর আমায় প্রশ্ন করিলেন—"কি রকম লাগছে মুকুজিবাবু?—একটা মহাকাব্যের সম্ভাবনার দিক দিয়ে জিগ্যেস করছি।"

বলিলাম—"ভালোই, কাঠামোটা ভালোই বলে মনে হচ্ছে তো।"

"শেষটা শুনুন এইবার। সহিষ্ণুতা যখন তার পরীক্ষায় প্রায় উত্তীর্ণ, সেই সময় ব্যাপারটা হোল।"

কতকটা সুস্থ হয়েছেন রঘ্‌ঘুবাবু। ওরা যখন ডাকলে ভালো মনে আসছে না তখন গুরু মহাত্মাজীর মতনই ঠিক করেছেন নিজেই একবার যাবেন হাসানপুরে। ঘোড়ার ওপর আর সম্ভব নয়, পালকির ব্যবস্থা করতে গেছে। রঘ্‌ঘুবাবু নিজের বৈঠকখানায় বসে আছেন, এমন সময় আন্দাজ ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের একটি যুবক বাইরের বারান্দায় এসে আভূমি নত হয়ে সেলাম করলে।

প্রশ্ন করলেন—'কে? কোথা থেকে আসছ?'

'আসছি হাসানপুর থেকে।'

হাসানপুরের নামে রঘ্‌ঘুবাবু একটু সচকিত হয়ে উঠলেন, প্রশ্ন করলেন—'কি খবর? এসো ভেতরে এসো।'

যুবকটি ভেতরে এসে নিজের কোমরের কাপড়ের মধ্যে থেকে একটি খুব ছোট্ট করে ভাঁজ-করা কাগজ বের করে হাতে দিলে। বেশ একটু উত্তেজিত হয়েই ভাঁজটা খুললেন রঘ্‌ঘুবাবু, তারপর চশমাটা চোখে দিয়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করে একটু চেয়ে থেকে বললেন —'মনে হচ্ছে বাংলা লেখা, কোথায় পেলে এটা?'

যুবক বললে—'হাসানপুরেই আমার বাড়ি, আমি জাতিতে নাপিত। আমার বোন ঐখানে মুসলমানদের বাড়িতে মেয়েদের নোক কেটে দেয়, মেহদি পরিয়ে দেয়। মহবুব মিয়ার বাড়িতে একটি মেয়ে নোক কাটাতে কাটাতে খুব লুকিয়ে চিঠিটি আমার বোনের হাতে দিয়ে দেয়। মেয়েটি নোতুন এসেছে ও বাড়িতে, বয়স তেইশ-চব্বিশ, ওরা এক আত্মীয়া বলে পরিচয় দিয়েছে,

নাকি গাজীপুর থেকে এসেছে। বলে বোবা। আর একটা কথা, দুদিন দেখেছে মেয়েটিকে, সর্বদাই দু'তিন জন তার কাছে কাছে থাকে। চিঠিটি নিয়ে আমার বোন সোজা আপনার কাছেই আসতে বলে দিয়েছে, আর কোথাও দাঁড়াই নি আমি।'

রঘুবাবু চঞ্চল হয়ে উঠলেন। 'মেয়েছেলে!...বোবা!... গাজীপুর থেকে!'—ঘরে পায়চারি করতে করতে কথাগুলোর মধ্যে থেকে যেন নতুন অর্থ বের করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। একটু পরে যুবকটিকে জিগ্যেস করলেন—'বাঙালী নেই কাছাকাছি কেউ?'

ওর উত্তরের অপেক্ষা না করেই চাকরটাকে ডেকে পাড়ার জন দুয়েক লোকের নাম করে তাদের ডেকে আনতে বললেন।

তাদের কাছেই টের পাওয়া গেল মাইল ছয়েক দূরে বিলৌরি গ্রামের মিড্‌ল্‌স্কুলে একজন বাঙালী সম্প্রতি হেড মাস্টার হয়ে এসেছেন। তাদের মধ্যে থেকেই একজন রঘুবাবুর ঘোড়া নিয়ে ছুটল। তখন বিকেল হয় হয়, সন্ধ্যে পর্যন্ত সে চিঠিটা তর্জমা করিয়ে নিয়ে ফিরল। লেখা আছে—আমি নোয়াখালির বাঙালী, কে হিন্দু আছেন বাঁচান, সব যায়।

রঘুবাবু যেন পাগল হয়ে উঠলেন, বললেন—'জগৎকিশোর কোথায়?'

দু মাইল দূরে জগৎকিশোরের বাড়ি, তখুনি ঘোড়ায় করেই লোক ছুটল। ফিরে এসে বললে সে আজ তিনদিন বাড়ি নেই।

এতটা আত্মসংযম হারাতে আজ ত্রিশ বৎসরের মধ্যে কেউ দেখেনি রঘুবাবুকে। যারা দুজন এসেছিল তারা আরও জনতিনেক লোককে ডেকে আনিয়েছিল—এরা পাঁচ জনেই রঘুবাবুর মতনই সত্যাগ্রহে প্রকৃত বিশ্বাসী। অনেক করে তাঁকে শান্ত করলে, বোঝালে গোলমাল করলে মেয়েটিকে সবিয়ে ফেলতে পারে, এমন কি হত্যাও করে লাস লুকিয়ে ফেলতে পারে। ঠিক হোল পরদিন জন চার পাঁচ মুখিয়া গোছের মুসলমানকে ডেকে তাদেরই বলা মেয়েটিকে আস্তে আস্তে উদ্ধার করে এখানে পৌঁছে দিয়ে যেতে। পাছে বাইরের হিন্দু দেখলে কেউ সন্দেহ করে এইজন্যে আলিজান বলে স্বরূপগড়েই একজন বিশ্বাসী মুসলমানকে পাঠানো হোল।

সন্ধ্যের একটু পরে বেরিয়ে সে রাত বারোটার পর ফিরে এল। বললে দুজন আসতে চাইল না, জনতিনেক আসছিল, গ্রাম থেকে খানিকটা এগিয়ে আসতে বেশ একটা ছোটখাটো দল এসে তাদের টেনে হিঁচড়ে ফিরিয়ে নিয়ে গেল, একজন একেবারে বুড়ো, বাকি দুজন মারধোরও খেলে একটু আধটু। আলিজান ঘোড়াটা মাইল খানেক দূরে একটা হিন্দুর বাড়িতে রেখে গিয়েছিল, কোন রকমে পালিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে এসেছে।

ক'জনে উদ্বিগ্নচিত্তে বৈঠকখানায় অপেক্ষা করছিলেন। রঘুবাবুর মুখ চোখ একেবারে সিঁদুরবর্ণ হয়ে উঠেছে। ওরা তবু একবার শেষ চেষ্টা করলে, বললে—'আমরা যাচ্ছি—এক্ষুনি, নিজেরা একবার চেষ্টা করি।'

ত্রিশ বৎসর আগেকার কণ্ঠস্বর ফিরে এল রঘ্‌ঘুবাবুর কণ্ঠে —'চেষ্টা!—চেষ্টা কাদের সঙ্গে করা চলে আপনারা এখনও বুঝলেন না!···কে আছে বাইরে?'

একটা অস্বাভাবিক কিছু চলেছে, চাকর-রেয়ৎ মিলে ছ'সাতজন বারান্দায় অপেক্ষা করছিল, সামনে এসে দাঁড়াল। রঘ্‌ঘুবাবু সেই রকম বজ্রকণ্ঠে বললেন—'আমি চর-শিশোধী থেকে হাসানপুর মুছে ফেলতে যাচ্ছি—মেয়েছেলের ইজ্জতের যার একটুও খেয়াল আছে—বালক থেকে নিয়ে বৃদ্ধ পর্যন্ত, সবাইকে যেতে বল্—যাদের ঘোড়া আছে তারা আমার সঙ্গে চলুক।'

ঘোড়া ছিল ক্লান্ত, পৌঁছুতে প্রায় ভোর হয়ে গেল, রঘ্‌ঘুবাবু একেবারে মহবুব মিয়ার বাড়ি গিয়ে উঠলেন। ক্লান্তিতে ক্রোধে অসংযত হয়ে রয়েছেন, পথে একটি কথা উচ্চারণ করেন নি। মহবুব বেশ সম্পন্ন বড় গৃহস্থ, চামড়ার বড় কারবার আছে। সবে দু'পাঁচ জন উঠেছে, তার মধ্যে মহবুবের বড় ছেলে সেলিম। সাত আট জন ঘোড়সওয়ারের হঠাৎ আবির্ভাবে সন্থোত্থিত গ্রামে ওরই মধ্যে একটু সাড়া পড়ে গেছে, জন দশ বারো লোক জড়ো হয়ে গেছে। রঘ্‌ঘুবাবু বজ্রকঠোর স্বরে সেলিমকে আদেশ করলেন—'তোমার ঘরে নোয়াখালির একটি হিন্দু মেয়ে আছে, বের করে আনো।'

কি যে হোল ঠিক বলা যায় না, বোধ হয় মেয়েটিকে এতদিন লুকিয়ে রেখে একটা নাম কিনে এতগুলো লোকের সামনে সেলিম

আর ভারুতার অপবাদটা নিতে চাইলে না। বেশ একটু রুক্ষ স্বরেই বললে—'আমার এখানে কেউ নেই।'

বাবু রঘুবীর সিংএর স্বর এক পরদা আরও চড়ল—'আছে, আমি ভেতরে গিয়ে দেখব।'

ওদিকেও এক পরদা চড়ল—'কোন হিন্দু মুসলমানের জেনানায় ঢুকতে পারে না।'

'আমি আশি বছরের বৃদ্ধ, দোষ নেই, এর চেয়ে ঢের বড় দোষ করছ তোমরা।'

আরও লোক জমতে আরম্ভ করেছে, কারুর কারুর হাতে হাতিয়ার। সাহস বাড়ার জন্যেই হোক বা পরমায়ু কমার জন্যেই হোক, সেলিমের মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল...'বুড়ো হলেও কাফের, আমি...'

আর শেষ করতে হোল না। খাপে তলোয়ার ছিল, সেলিমের কাঁচা মাথাটা সঙ্গে সঙ্গে ধড় থেকে পড়ল ছিটকে।

সেই হোল সঙ্কেত। ঘোড়া ক্লান্ত থাকার জন্যে রঘুবাবুর দেরি হয়ে গিয়েছিল, স্বরূপগড়ের হিন্দুরা প্রায় এসেই পড়েছিল; আরও অনেক গ্রামের হিন্দু—জানেনই, এসব খবর যেন হাওয়ায় ওড়ে। সেই সকাল থেকে নিয়ে দুপুর পর্যন্ত চলল ধ্বংসলীলা, হত্যা, অগ্নি-কাণ্ড। মহবুব মিয়ার বেটাছেলেদের কেউই রইল না। দু'চারটি শিশু আর জেনানার মেয়েদের পাশে নিয়ে রঘুবাবু স্থিরদৃষ্টিতে একদিকে চেয়ে রইলেন দাঁড়িয়ে, তার মধ্যে একটি মেয়ে কাপড়ে ঢাকা, তাঁর পায়ের কাছে শোয়ান। তার

গলার প্রায় সমস্তটা কাটা। কোথা থেকে একটু সিঁদুর জোগাড় করে শেষ মুহূর্তে বোধ হয় সীমন্তে দিতে যাচ্ছিল, দুটি আঙুলের ডগায় লেগে রয়েছে।

সম্মোহিতের মতন স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে রঘুবাবু, দৃষ্টি সামনে নিবদ্ধ! হাসানপুর ক্রমেই একটা অঙ্গারস্তূপে পরিণত হয়ে যাচ্ছে, সুঁতির গৈরিক জল হয়ে উঠছে রক্ত-রাঙা। দুপুর গড়িয়ে যখন বিকেল হয়ে এসেছে তাঁর যেন হুঁস হোল। হুঁস হওয়া অর্থাৎ মুখ দিয়ে কথা বেরুল, জিগ্যেস করলেন—'এটা কি জায়গা ?'

পাশে যারা দাঁড়িয়ে ছিল, বললে—'হাসানপুর হুজুর।'

রঘুবাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন একটু, যেন কি ভাবছেন, তারপর বললেন—'ও! নোয়াখালির সেই মেয়েটি!...মনে পড়ছে।'

কাপড়ে ঢাকা মেয়েটির দেহ পাশেই শোওয়ান। দৃষ্টি ঘুরিয়ে তার দিকে একটু চেয়ে রইলেন, একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ল, কতকটা আপন মনেই তুলসী-রামায়ণের একটা দোঁহা বিড় বিড় করে আওড়ালেন, তারপর আপন মনেই অর্ধস্ফুটস্বরে বললেন—'হবেই, মেয়ের ওপর অত্যাচারে সোনার লঙ্কা ছারখার হয়েছিল। আমি কি করতে পারি ?...'

তারপরেই কণ্ঠস্বর গেল বদলে, দৃষ্টিতে ভরে উঠল আতঙ্ক, যেন হঠাৎ এমন একটা কি সর্বনাশের কথা মনে পড়ে গেছে যার সামনে এ সংহার-লীলা অতি তুচ্ছ। ডান হাতটা একটু

স্বমুখের দিকে বাড়িয়ে খদ্দরের আস্তিনটার দিকে চেয়ে বললেন —,কিন্তু আমার খদ্দর!—আমার ত্রিশ বৎসরের ব্রত!—আমি যে তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম—আজ যে দেহমনকে খদ্দরে আবৃত করলাম তাদের দ্বারা কখনও হিংসার আচরণ হবে না—তার কি হোল?…'

পাশের লোকেরা বললে—'হুজুর তো চেষ্টা করেছিলেন…'

রঘুবাবু অসহায় ব্যাকুল দৃষ্টিতে সবার মুখের দিকে চাইলেন, হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বললেন—'চেষ্টা নয়; চেষ্টা করলাম —ওটা তো একটা কথার প্যাঁচ। রাখলাম না সে প্রতিজ্ঞা! —কি হবে? হাসানপুর প্রায়শ্চিত্ত করে শুদ্ধ হোল—আমার প্রায়শ্চিত্ত কি করে হবে?…কি হোল!'

তারপর ব্যাপারটা এত হঠাৎ হোল যে কেউ যেন মাথার ঠিকই রাখতে পারলে না। প্রায় হাত ত্রিশেক দূরে মহবুব মিয়ার একটা পাহাড় প্রমাণ পোয়ালের ডাঁই জ্বলতে জ্বলতে কোমর পর্যন্ত নেমে এসেছিল—কাঠাখানেক নিয়ে একটা আগুনের চাপ। ভরা যৌবনের শক্তি আর ক্ষিপ্রতা পায়ে করে বাবু রঘুবীর সিং হঠাৎ সেইদিকে দিলেন ছুট—মুখে শুধু—'আমার খদ্দর!—আমার প্রতিজ্ঞা!—আমার প্রায়শ্চিত্ত!' —ব্যাপারটা কেউ বুঝে ওঠবার আগেই সমস্ত শক্তি একত্র ক'রে সেই গনগনে আগুনের মাঝখানে দিলেন ঝাঁপ।"

* * *

মিশিরজী চুপ করিলেন। যুবক সামান্য একটু অপেক্ষা করিয়া

বলিল—"বোধ হয় শেষ হয়েছে আপনার, এবার আমার কথাটা বলি —বাবু রঘুবীর সিংকে একটু দেখতে যেতে হবে, তিনি অসুস্থ।"

মিশিরজী প্রশ্ন করিলেন—"কোন্ রঘুবীর সিং?"

"স্বরূপগড়ের—যাঁর কথা আপনি বলছিলেন।···আমার নাম জগৎকিশোর।"

মিশিরজী একটুও অপ্রতিভ হইলেন না, নিতান্ত সহজ কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—"অসুখটা কি? কবে থেকে···?"

আমি আর নিজের কৌতূহল চাপিতে পারিলাম না, মিশিরজীর প্রশ্নের মাঝখানেই যুবককে জিজ্ঞাসা করিলাম—'আগুনে দেন নি ঝাঁপ তিনি?'

যুবক কবিরাজকে বোধ হয় সাক্ষাৎ ভাবে ক্ষুণ্ণ করিতে সাহস করে নাই, আমার প্রশ্নে মনের ভাবটা প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইয়া বেশ একটু অসহিষ্ণু কণ্ঠেই বলিল—"আমার গুরু শিশোধিয়া রাজপুত, অন্যায়ের জন্যে দুর্বৃত্তকে সাজা দিয়েছেন, এর মধ্যে প্রায়শ্চিত্তের কথা কোথা থকে আসে? সাজা দিতে অসমর্থ হলেই বরং করতেন প্রায়শ্চিত্ত···"

বর্ধিত কৌতূহলেই আবার প্রশ্ন করিলাম—"তা'হলে ব্যাপারখানা··· ?"

"মোটামুটি ঐ, তবে···"

মিশিরজীর মুখের পানে চাহিয়া অল্প একটু হাসিল, ঐ, কবিরাজ বলিয়াই সমালোচনাটা বোধ হয় সম্পূর্ণ করিল না।